

১৪৩২ বঙ্গাব্দ
শাশ্বত সত্য
ডিসেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

সম্পাদকীয়



এসএসএস' প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা **'শাশ্বত সত্য'** দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। এটি আমাদের কাছে নিছক সময়গত সাফল্য নয়; বরং এক দীর্ঘ, শ্রমসাধ্য ও সচেতন সাধনার ফল। সত্যকে অনুসন্ধান করা, সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের পক্ষে নির্ভীকভাবে দাঁড়ানো—এই ব্রত নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু। দ্বিতীয় বর্ষে পা রেখে সেই পথের দুরূহতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আজকের সময়ে, যখন ভোগবাদ, ভ্রান্ত তথ্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক অলসতা সমাজকে ক্রমশ গ্রাস করছে, তখন কেবল জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ ও সত্যের প্রচারকে উদ্দেশ্য করে একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা মোটেই সহজ নয়। এর পেছনে কোনো আর্থিক লাভ বা জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষা নেই—আছে শুধু একটি বিশ্বাস, সত্যই জয়ী হয়।

সীমিত সমর্থক ও পাঠকসংখ্যা সত্ত্বেও আমরা নিরাশ নই। এখন পর্যন্ত তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, পাঠক কম হলেও আমরা কঠোর ব্রত পালনের ন্যায় কর্ম করে চলেছি। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাসভিত্তিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের পাশাপাশি কবিতা, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও সহজ সংস্কৃত শিক্ষার মতো বিষয়বস্তু নিয়ে এই পত্রিকা আজ কতটা দুর্লভ—তা পাঠকগণই বিচার করবেন। বিশেষত প্রশ্নোত্তর পর্বে এমন বহু প্রশ্নের উত্তর রয়েছে, যা আমাদের সকলের মনেই কোনো না কোনো সময় উঁকি দেয়।

আমরা জানি, গুটি কয়েক মানুষের আগ্রহ নিয়েই হয়তো এই পথচলা। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী—সত্যের লড়াই কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর নির্ভর করে না। আপনাদের মতামত, পরামর্শ ও লিখিত প্রবন্ধের মাধ্যমে পাশে থাকাই আমাদের এগিয়ে চলার সবচেয়ে বড় শক্তি।

সত্যমেব জয়তে....

মৃগাঙ্ক রায়

সম্পাদক, শাশ্বত সত্য

গবেষক, সনাতন শাস্ত্র গবেষণা কমিটি

সত্যের সন্ধানে সনাতন

সম্পাদকীয় | অভিমত



সমাজকে আলোকিত করার প্রত্যয়ে প্রকাশিত 'শাশ্বত সত্য' পত্রিকার এই সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। একটি গবেষণাভিত্তিক পত্রিকার ক্ষেত্রে তথ্যের নির্ভুলতা, শাস্ত্রসম্মত উদ্ধৃতি এবং ভাষার শুদ্ধতা—এই তিনটি দিক সমান গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে মতামত দ্রুত ছড়িয়ে পড়লেও সব তথ্য যে যাচাই-বাছাই করা হয়, তা নয়। সেই শূন্যস্থান পূরণের এক ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবেই **'শাশ্বত সত্য'** তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাস—এই তিনটি বিষয়েই চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই আমাদের লক্ষ্য। একই সঙ্গে পাঠকের চিন্তাকে শানিত করাও এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রতিটি লেখা পাঠযোগ্য করার পাশাপাশি তার মূল বক্তব্য যেন বিকৃত না হয়, সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত লেখকবৃন্দ যে আন্তরিকতা ও অধ্যবসায় নিয়ে কাজ করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পাঠকদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ—এই সংখ্যাটি মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, আমাদের ত্রুটি থাকলে ধরিয়ে দিবেন এবং আপনার সুচিন্তিত মতামতের মাধ্যমে আমাদের আরও সমৃদ্ধ হতে সহায়তা করবেন।

জয় সনাতন 🙏

পৃথা সান্যাল

সংশোধক, শাশ্বত সত্য

বর্তমান সময়ে এই পত্রিকার কাজ যেভাবে ধারাবাহিকতা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সকলের শ্রম ও আন্তরিকতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করি। আজকের দিনে বহু অনলাইন হিন্দু প্ল্যাটফর্ম যেখানে প্রচারমুখী ও ভ্রান্ত তথ্যে পরিপূর্ণ, সেখানে এমন একটি চিন্তাশীল ও তথ্যনিষ্ঠ পত্রিকার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই উদ্যোগ নতুন প্রজন্মের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি সচেতন আগ্রহ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস করি। শাস্ত্র, ইতিহাস ও যুক্তির সমন্বয়ে গঠিত এই ধরনের প্রয়াস পাঠকের বোধকে আরও গভীর করে তোলে। আবেগের বদলে বৌদ্ধিক অনুসন্ধানকে গুরুত্ব দেওয়ার যে ধারা এখানে দেখা যায়, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পত্রিকার পাঠকসংখ্যা ও প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাক—এই কামনাই রইল।

নির্ভীক সরকার

সংশোধক, শাশ্বত সত্য

ত্রৈমাসিক

শ্বাশত সত্য

সূচিপত্র

২য় বর্ষ • ১ম সংখ্যা

ডিসেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

২০২৫-২৬ ইং | ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সার্বিক পরিচালনায় ও প্রকাশনায়:
'সত্যের সন্ধানে সনাতন'



অদ্বৈত বেদান্ত অনুযায়ী 'ব্রহ্মের স্বরূপ'

বৃহদ্রথ সান্যাল

ব্রহ্ম নিয়ে একেক শাস্ত্রে একেকরকম বিশ্লেষণ রয়েছে বিধায় অনেকে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে দ্বিধান্বিত হন। অদ্বৈত বেদান্ত কিছুটা জটিল মনে হতে পারে কিন্তু যদি বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাহলে জটিল বিষয়ও সহজ হয়ে যাবে। আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে - ব্রহ্মকে বা ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে কেন অবগত হওয়া প্রয়োজন? সেটার উত্তর ব্রহ্মসূত্র ১/১/১ হতে পাওয়া যায় - "পরস্পর বিরোধী বহু দার্শনিক মতবাদের জন্য যে ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহার সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন।" (শঙ্কর ভাষ্য অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)। এছাড়াও ব্রহ্মসূত্রের ভামতীতে রয়েছে - '...**জ্ঞানেন হি প্রমাণেনাবেগন্তমিষ্টং ব্রহ্ম;** অর্থাৎ, জ্ঞানরূপা প্রমাণবৃত্তির অবগমনীয় বস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম; সুতরাং প্রাপ্য বস্তু; সেই জন্য তিনিই প্রোক্ত ইচ্ছার প্রধান বিষয়। ব্রহ্মজ্ঞানই (ব্রহ্মকে জ্ঞানগম্য করাই) পুরুষার্থ, অর্থাৎ মুমুক্ষু পুরুষের একমাত্র লক্ষ্য। যদি তাহাই হইল, তবে ব্রহ্মই জিজ্ঞাসিতব্য, অর্থাৎ ব্রহ্মই যে জিজ্ঞাসার বিষয় (কর্ম), ইহা নির্দ্ধারিত হইল।'

'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ নিরূপণে রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাভারতের তথ্য ব্যবহার করে লিখেছেন -

এই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ-যাহা বৃহৎ তাহা। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে (৩৩৬.২) শ্লোকে আছে - '**বৃহদ্ ব্রহ্ম মহচ্চেতি শব্দাঃ পর্য্যবোচকাঃ।**'

অন্যদিকে, ভামতীতেও পাওয়া যায় - '...বৃহ + মন্ = ব্রহ্ম। বৃহ-ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি-যাহার অন্য নাম মহত্ত্ব। মন্-প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয় অর্থাৎ অবধিরাহিত্য। যিনি নিরতিশয় মহান্-যাঁহা অপেক্ষা বৃহৎ (বড়) ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট

আর কিছু নাই, তিনিই ব্রহ্ম...।' তবে ব্রহ্ম দ্বারা কি বুঝায় সেটা বুঝতে হলে উপনিষদ থেকেই বুঝতে হবে। কারণ, উপনিষদ নিজেই বলেছে - '..উপনিষদবিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান হইলেই স্পষ্টরূপে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে।' (অথর্ববেদ, নৃসিংহতাপনী উপনিষদ, উত্তরভাগ - ৯/২০, খণ্ডাংশ)
উপনিষদে ব্রহ্মের যে লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে তা দ্বিবিধ, যথা: স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ। বেদান্ত সংজ্ঞামালিকায় বলছে - **'তটস্থং চ স্বরূপং চ লক্ষণং ব্রহ্মণো দ্বিধা'**। ব্রহ্মকে জানার জন্য ব্রহ্মের এই দুই লক্ষণ দ্বারা মূলত কি বুঝানো হচ্ছে সেটার জ্ঞান লাভও আবশ্যক।

স্বরূপ লক্ষণ: সহজে বললে যা স্বরূপ প্রকাশ করে তাই। **'স্বরূপং সদ্ ব্যাবর্তকং স্বরূপলক্ষণম্'** - যাহা সর্বদা স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, পরন্তু কল্পিত অন্যবস্তুর নিষেধক হয়, তাহা স্বরূপলক্ষণ। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতি বচন তথা বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ বচনে আনন্দ, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সাক্ষাৎ সম্পর্কে ব্রহ্মবস্তুকেই বুঝায়। একারণে এগুলোকে ব্রহ্মের স্বরুপ লক্ষণ বলা হয়।

তটস্থ লক্ষণ: **'কাদাচিৎকত্বে সতি ব্যাবর্তকত্বং তটস্থলক্ষণত্বম্'** - যাহা লক্ষ্যে কদাচিৎ বিদ্যমান থাকিয়া অন্য পদার্থের ব্যাবর্তক বা নিষেধক হয়, তাহা তটস্থলক্ষণ। শ্রুতিতে আছে -
'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।'
অনুবাদ: যাঁহা হইতে ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং বিনাশ সময়েও যাহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর। তাহাই ব্রহ্ম। (কৃষ্ণ যজুর্বেদ, তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩/১/১, খণ্ডাংশ)
তদ্রুপ, **'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'** (সামবেদ, ছান্দোগ্যোপনিষদ - ৩/১৪/১, খণ্ডাংশ) অর্থাৎ, সবকিছুই ব্রহ্মময়। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ এই দুটো তথ্যসূত্র ব্যবহার করে বলেছেন - 'এই স্থলে ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর দ্বারা ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়ায় ইহাকে ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ বলা হয়।'
সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ব্রহ্ম আবার দ্বিবিধ। শ্রুতি অনুযায়ী সগুণ ও নির্গুণ ভিন্ন তত্ত্ব নয় বরং একই তত্ত্ব। যিনি স্বতঃ নির্গুণ, তিনিই নিজ শক্তি মায়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সগুণ হন। গুটিপোকা যেমন জাল রচনা করে নিজেকে সেই জালে আবৃত করে, তদ্রুপ নির্গুণ ব্রহ্মও নিজেরই অনাদি শক্তি মায়া জালে আপনাকে আবৃত করে সগুণ ও সবিশেষ হন। সগুণ ব্রহ্মকে সাকার, নিরাকার এবং উভয়রূপও বলা হয়। এঁকেই ঈশ্বর, কার্য্য-ব্রহ্ম, মহেশ্বর, বিষ্ণু, শিব, বিধাতা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। কিছু নাম আবার নির্দিষ্ট রূপ ও গুণের প্রকাশক রূপেও চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, নির্গুণ ব্রহ্মকে নির্বিশেষ, নিরাকার, শুদ্ধব্রহ্ম, কেবলব্রহ্ম, পরব্রহ্ম বলা হয়। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের ভাষায় - 'সগুণব্রহ্মই জ্ঞেয় বা উপাস্য হন। সগুণব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ হয়। নির্গুণব্রহ্ম অসঙ্গ, তাহার সহিত সম্বন্ধও সম্ভব হয় না। এজন্য তাঁহাকে অদ্বৈতবস্তু বলা হয়।'



নির্গুণ ব্রহ্মের শ্রুতি প্রমাণ দেখা যাক -

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।

(কৃষ্ণ যজুর্বেদ, কঠ উপনিষদ - ১/৩/১৫)

অনুবাদ: যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ বিহীন, যিনি অক্ষয় শাশ্বত অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহত্তত্ব হইতে বিলক্ষণ ও কূটস্থ নিত্য, তাঁহাকে অবগত হইলেই সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন।
সগুণ ব্রহ্ম সম্পর্কিত শ্রুতি প্রমাণও দেখা যাক -

অশরীরং শরীরেধনবস্থেস্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।।

(কৃষ্ণ যজুর্বেদ, কঠ উপনিষদ - ১/২/২২)

অনুবাদ: বিভিন্ন দেহে অশরীররূপে বর্তমান এবং অনিত্যবস্তুর মধ্যে নিত্যরূপে বিরাজমান সেই সুবিশাল ও সর্বব্যাপী আত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া ধীমান ব্যক্তি শোকহীন হন।

লক্ষণীয়, অশরীর রূপে গুণাদি সম্পন্ন বিভিন্ন দেহে অবস্থান করেন বিধায় ব্রহ্মের সগুণ রূপ সিদ্ধ হয়। গুণহীন হয়ে গুণের সৃষ্টি হয় না। এ নিয়ে 'মায়া' সম্পর্কিত লেখাটি পড়লে পাঠকগণ উপকৃত হবেন। অদ্বৈত পরম্পরায় ব্রহ্মের পাঁচটি সতন্ত্র রূপকে চূড়ান্ত ও সমান মান্য করা হয়। এই পাঁচ রূপকে কেন্দ্র করেই ভারতবর্ষীয় পঞ্চমত গড়ে উঠেছে। উপরে বর্ণিত দ্বৈতাদি ভাব তথা দ্বৈতাদি দর্শনের ব্যাবহারিক মান্যতা প্রদানের মাধ্যমে এবং পঞ্চমতের আরাধ্যের অভেদ দর্শনের মাধ্যমে অদ্বৈত যে শুধু বেদান্তের সূক্ষ্ম বিষয় ব্যাখ্যা করেছে তাই নয়, পাশাপাশি সনাতনীদের একতার বীজও বপন করেছে।



ব্রহ্মের স্বরুপ সম্পর্কে যতটুক সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি পাঠকগণ উপকৃত হবেন!

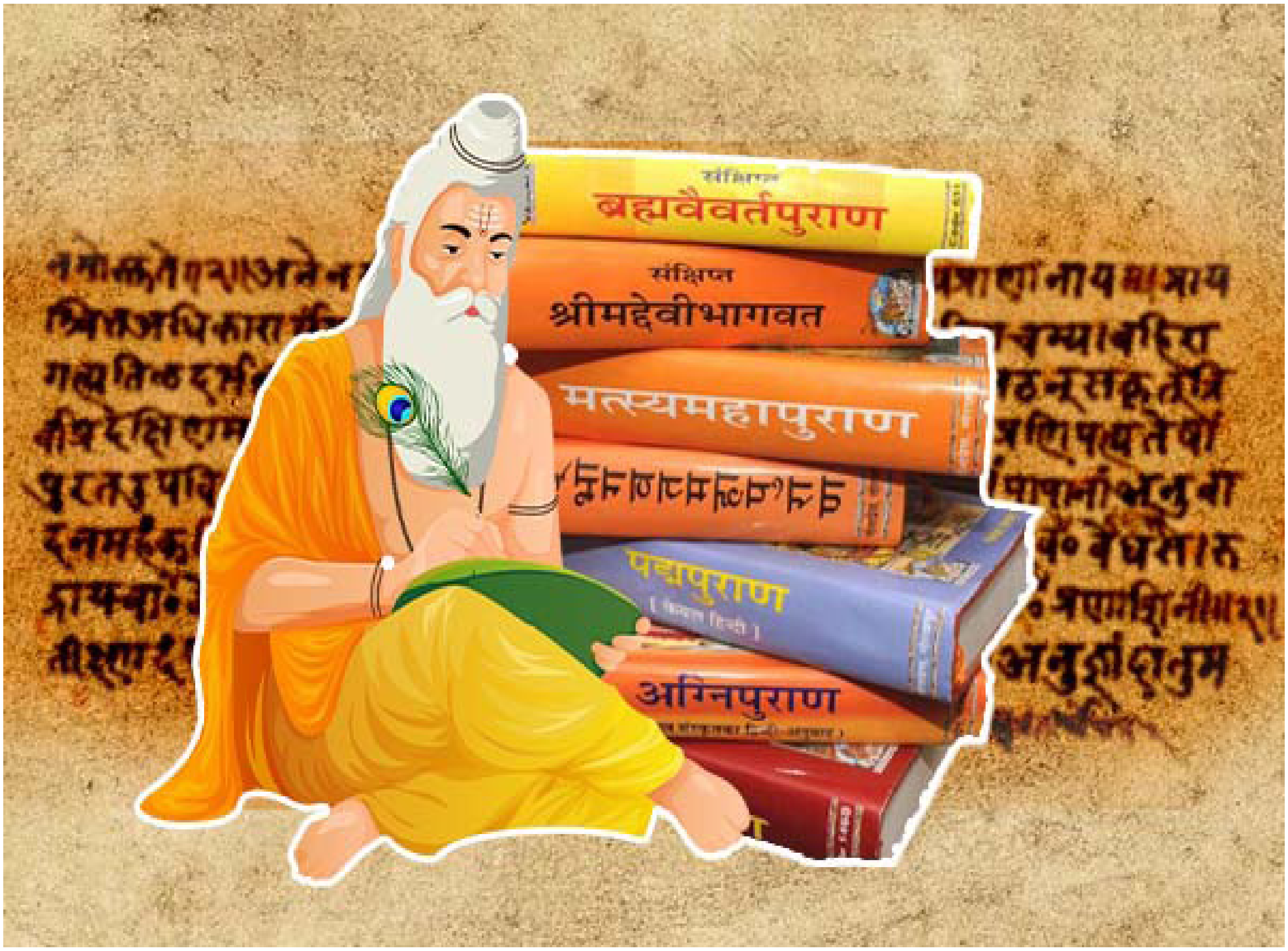
বন্দে শঙ্করাচার্যম্🙏

তথ্যসূত্র:

১) ব্রহ্মসূত্র (ভামতী) - দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
২) ব্রহ্মসূত্র - স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
৩) বেদান্ত সংজ্ঞা মালিকা - স্বামী ধীরেশানন্দ
৪) উপনিষদ - দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
৫) উপনিষদ গ্রন্থাবলী - স্বামী গম্ভীরানন্দ
৬) উপনিষদ গ্রন্থাবলী - সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭) অদ্বৈতবাদ - রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
৮) বেদান্ত দর্শন, অদ্বৈতবাদ - ডা: শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী

পুরাণের সংখ্যা এবং নাম বিভ্রান্তি নিরসন

বিবেক রায়



বর্তমানকালে প্রচলিত ১৮ মহাপুরাণের নামসমূহ নিয়ে একেক পুরাণে একেক তালিকা দেওয়া থাকায় এক রকম বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে তারই নিরসন করার যথাযথ প্রয়াস করব।

সনাতন ধর্মে সময় আপেক্ষিক। ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প। রাত্রিভাগ নিষ্ক্রিয়, কেননা তখন সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়।

৪ যুগ = ১ চতুর্যুগ

৭১ চতুর্যুগ = ১ মন্বন্তর

১৪ মন্বন্তর = ১ কল্প

সুতরাং ১ কল্প = (৭১ x ১৪) = ৯৯৪ বা প্রায় ১০০০টি চতুর্যুগের সমপরিমাণ সময়।

এই পরিমাণ হিসাবানুযায়ী, প্রতি কল্পের প্রতিটি মন্বন্তরের প্রতি দ্বাপর যুগে পরাশরনন্দন মহর্ষি বেদব্যাস ৪ লক্ষ শ্লোক সম্বলিত ১৮ টি পুরাণকে বিভাজিত করেন।

পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেহনঘ।

(মৎস্য পুরাণ: ১/৫৩/৪)

অনুবাদ: কল্পান্তরে মাত্র একখানি পুরাণ ছিল।

ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে।
চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।।

তথাষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে।
অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটি প্রবিস্তরম্।।

(মৎস্য পুরাণ: ১/৫৩/৯-১০)

অনুবাদ: মৎসরূপধারী ভগবান নারায়ণ মহর্ষি মনুকে বলছেন, ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া আমি যুগে যুগে পুরাণসমূহের সংরক্ষণ করি। প্রতি দ্বাপরে আমি চারলক্ষ শ্লোক বিশিষ্ট পুরাণ ১৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া এই ভূর্লোকে আমি প্রকাশ করি। কিন্তু দেবলোকে এখনো ১০০ কোটি শ্লোক সম্বলিত পুরাণ প্রচলিত আছে।

কল্প কয়টি এবং বর্তমানে কোন কল্প চলছে?

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডের ৪৫৯ তম অধ্যায়ের "বালরূপধারী ব্রহ্মার মহিমা এবং ব্রহ্মাজীর আয়ুর মান" শিরোনামে হিন্দি সংস্করণে থাকা অংশে ভগবান শিব মাতা পার্বতীর নিকট বলেছেন, ব্রহ্মার কল্প ত্রিশটি। যথা:

১) শ্বেত-কল্প ২) নীললোহিত ৩) বামদেব ৪) রথন্তর ৫) রৌরব ৬) প্রাণ ৭) বৃহৎ-কল্প ৮) কন্দর্প ৯) সদ্যঃকল্প ১০) ঈশান ১১) ধ্যান ১২) শাশ্বত ১৩) উদান ১৪) গারুড় ১৫) কৌর্ম বা কূর্ম ১৬) নারসিংহ ১৭) সমাধি ১৮) আগ্নেয় ১৯) সোম ২০) ভাবন ২১) তৎপুরুষ ২২) বৈকুণ্ঠ ২৩) অর্চিত ২৪) রুদ্র ২৫) লক্ষ্মী ২৬) সারস্বত ২৭) বৈরাজ ২৮) গৌরী-কল্প ২৯) মাহেশ্বর ৩০) পিতৃ-কল্প বা পাদ্ম-কল্প [মহাপ্রলয়ের পর সকল কিছু ভগবানের নাভিপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে বলে ইহা পাদ্ম-কল্প]

মৎস্য পুরাণের ২৯০ তম অধ্যায়ে ভগবান মৎস্য সত্যব্রত/শ্রাদ্ধদেব/বৈবস্বত মনুর নিকট সংক্ষেপে কল্পনামসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা:

১) শ্বেত-কল্প ২) নীললোহিত ৩) বামদেব ৪) রথন্তর ৫) রৌরব ৬) দেবকল্প ৭) বৃহৎ-কল্প ৮) কন্দর্প ৯) সদ্যঃকল্প ১০) ঈশান ১১) তমঃকল্প ১২) সারস্বত ১৩) উদান ১৪) গারুড় ১৫) কৌর্ম বা কূর্ম ১৬) নারসিংহ ১৭) সমানকল্প ১৮) আগ্নেয় ১৯) সোমকল্প ২০) মানবকল্প ২১) তৎপুমান্ কল্প ২২) বৈকুণ্ঠ কল্প ২৩) লক্ষ্মীকল্প ২৪) সাবিত্রী ২৫) ঘোরকল্প ২৬) বারাহ-কল্প ২৭) বৈরাজ ২৮) গৌরী-কল্প ২৯) মাহেশ্বর ৩০) পিতৃ-কল্প বা পাদ্ম-কল্প [মহাপ্রলয়ের পর সকল কিছু ভগবানের নাভিপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে বলে ইহা পাদ্ম-কল্প]

উক্ত দুটি লিস্টে বাকি সব ঠিক থাকলেও ২৩, ২৪, ২৫ & ২৬ নং কল্প চারটি খুবই সংশয়পূর্ণ এবং এদের পরিচয় অপরিষ্কার!!

লক্ষ্য করলে দেখবেন, বিশেষত স্কন্দপুরাণে সারস্বত-কল্পকে আলাদা করা হয়েছে এবং মৎস্য পুরাণে বারাহ-কল্পকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে!!

"সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একরাত্রি হয়।" (গীতা: ৮/১৭)

"ব্রহ্মার দিনের সমাগমে সমস্ত জীব অব্যক্ত থেকে অভিব্যক্ত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির সমাগমে তা পুনরায় অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়।" (গীতা: ৮/১৮)

অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবাভাগ = ১টি কল্প; এই সময় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও জীবসমূহের সৃষ্টি হয়। রাত্রির আগমনে সকল কিছু লয় প্রাপ্ত হয়ে বিলীন হয়ে যায়।

কিন্তু উল্লেখ্য, ব্রহ্মার দিবাভাগে সৃষ্টির সৃজন হয় বিধায় উক্ত ৩০টি কল্পের নাম দিবাভাগেরই। রাত্রিভাগ নিষ্ক্রিয়, কেননা তখন সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মা সুপ্তাবস্থায় চলে যান। তাই রাত্রিভাগ; দিবাভাগের সমপরিমাণ হলেও এর নামকরণ নাই। দিনভাগ + রাত্রিভাগ = ব্রহ্মার পূর্ণ এক অহোরাত্র বা দিবারাত্রি। এরকম ৩০ অহোরাত্র মিলে ব্রহ্মার একমাস। এই একমাসের ভিতরে ৩০টি কল্প অতীত হয়ে যায়। এইরকম ১২ মাসে এক বছর।

ব্রহ্মার শতবর্ষ পরিমাণ আয়ু। কিন্তু এই ১০০ বৎসর পৃথিবীর আনুমানিক 311.04 Trillion বছরের সমান। আয়ু শেষ হলে ব্রহ্মার মৃত্যু ঘটে।

[তথ্যসূত্র: মৎস্য পুরাণ: ২৯০/১১ & স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ৪৫৯ তম অধ্যায় & শ্রীমদ্ভাগবত: ৩য় স্কন্দ, ১১ অধ্যায়]

ব্রহ্মার এই আয়ুস্কাল ২ ভাগে বিভক্ত। পূর্ব পরার্ধ (৫০ বছর) এবং দ্বিতীয়ার্ধ বা দ্বিতীয় পরার্ধ (৫০ বছর)। বর্তমানে দ্বিতীয় পরার্ধের সময়কাল চলছে....

অতএব বলা যায়, ব্রহ্মার একমাসে ৩০টি কল্প হলে; ১২ মাসে ৩৬০টি কল্প গত হয় এবং ৫০ বছর বা ১ পরার্ধ সময়কালের মধ্যে চক্রাকারে ১৮০০০টি কল্প গত হয়। [১ পরার্ধ = ১৮০০০টি কল্প পরিমাণ সময়।]

এক পরার্ধের মধ্যে যতবার ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন কিরূপ প্রলয় হয়? কেননা মহাপ্রলয় তো কেবল ব্রহ্মার ১০০ বছর পূর্ণ হলেই সম্ভব; তাহলে তার জীবনকালের প্রতি রাতে কি আংশিক প্রলয় হয়?

ঋষি মৈত্রেয় বিদুরকে বিষ্ণু ভাগবত পুরাণ শোনানোর সময় সৃষ্টি-প্রলয়ের ক্ষণিক ইঙ্গিত দিয়ে ব্যাখ্যা করে বলেছেন-
ব্রহ্মার যখন রাত্রি উপস্থিত হয়, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সেই সময় নিদ্রা যান। (ভাগবত: ৩/১১/২২)
নিশার অবসানে যখন ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ নতুন কল্পের আরম্ভ হয়, তখন পুনরায় ত্রিলোকের সৃষ্টি শুরু হয়। (ভাগবত: ৩/১১/২৩)
রাত্রিকালে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই তিন লোক এবং অসুর, মানুষ, দেবতা ও পিতৃগণের তিরোভাব হয়। (ভাগবত: ৩/১১/২৬)
ব্রহ্মার রাত্রিকালে ত্রিলোক দৃষ্টির অগোচর বা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং চন্দ্র ও সূর্য নিষ্প্রভ বা জ্যোতিহীন হয়ে পড়ে। (ভাগবত: ৩/১১/২৯)



সঙ্কর্ষণ বা শেষনাগের মুখনিঃসৃত অগ্নির ফলে এই আংশিক প্রলয় হয়, ত্রিলোক দগ্ধ হয়ে যায়। এই কালাগ্নির উত্তাপে পীড়িত হয়ে ভৃগু আদি ঋষিগণ মহর্লোক থেকে উচ্চতর লোকে জনলোকে গমন করেন। (ভাগবত: ৩/১১/৩০)
[এই লেলিহান অগ্নি সকল কিছুকে দগ্ধ করার পর] মহাজাগতিক সমস্ত সমুদ্র বর্ধিত হয় এবং প্রচন্ড বায়ুবেগে জলরাশিসমূহ প্লাবিত হয়ে, ত্রিভুবনকে পরিপ্লাবিত করে।
(ভাগবত: ৩/১১/৩১)
ভগবান হরি তখন মুদ্রিত নয়নে যোগনিদ্রায় অনন্তনাগের উপর শয়ন করেন, এবং জনলোকের অধিবাসীরা তখন কৃতাঞ্জলিপুটে তার স্তব করেন।
(ভাগবত: ৩/১১/৩২)
এভাবেই প্রতিনিয়ত সৃষ্টি-আংশিক প্রলয়ের মাধ্যমে কেবল তিনটি লোক দগ্ধ হয় এবং ব্রহ্মারও একশত বৎসর পূর্ণ হয়। কালের গতি অনুসারে ব্রহ্মাসহ ভৃগু আদি ঋষিগণের পরমায়ুও ১০০ বৎসর।
(ভাগবত: ৩/১১/৩৩)
শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্দের ১১ অধ্যায়ে মৈত্রেয় বিদুরকে, পদ্মপুরাণে পুলস্ত্য ভীষ্মকে এবং স্কন্দপুরাণে ভগবান শিব দেবী পার্বতীকে ব্রহ্মার আয়ুস্কাল ও কল্প সম্পর্কে বলেছেন -
পূর্ব পরার্ধের আদিতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই এটি ব্রাহ্মকল্প। বেদের আবির্ভাব ও ব্রহ্মার জন্ম একসঙ্গে হয়েছিল।
(ভাগবত: ৩/১১/৩৫)
অর্থাৎ প্রথম শ্বেত-কল্পই ব্রাহ্মকল্প।
পূর্ব পরার্ধের অন্তে যে কল্পের আবির্ভাব হয়, তাকে পাদ্মকল্প বলা হয়। সেই কল্পে ভগবান হরির নাভিরূপ সরোবরে সমগ্র বিশ্ব পদ্মময় বা পদ্মরূপে বিদ্যমান ছিল।
(শ্রীমদ্ভাগবত: ৩/১১/৩৬)
হে অনঘ! ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের পূর্ব পরার্ধ অতীত হইয়াছে। উহার শেষে পাদ্ম নামক মহাকল্প অতীত হইয়াছে।
(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড: ৩/২৩)
অর্থাৎ সর্বশেষ পিতৃ-কল্পই পাদ্ম-কল্প। কেননা তখন আকস্মিক প্রলয়ে ব্রহ্মাসহ, সমগ্র বিশ্ব নারায়ণের নাভিপদ্মে প্রবেশ করে অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত হয়ে যায়।
অতঃপর দ্বিতীয় পরার্ধের আদি কল্পই "বারাহ কল্প" নামে বিখ্যাত। সেই কল্পে ভগবান বিষ্ণু বরাহ মূর্তিতে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে প্রকটিত হয়েছিলেন।
(শ্রীমদ্ভাগবত: ৩/১১/৩৭)

হে নৃপ! বর্তমানে দ্বিতীয় পরার্ধের প্রথম এই "বারাহ কল্প" চলিতেছে।
(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড: ৩/২৪)
দেবি! ব্রহ্মাজীর পরম আয়ুর এক পরার্ধ অতীত হয়েছে। ....এই সময় "বারাহ-কল্প" চলিতেছে।
(স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ৪৫৯ তম অধ্যায় [হিন্দি সংস্করণ])
এক্ষেত্রে ক্রমানুসারে দ্বিতীয় পরার্ধে পুনরায় ব্রাহ্মকল্প হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে বারাহ কল্প বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, দ্বিতীয় পরার্ধের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত শ্বেত-কল্পকেই বারাহ কল্প বলা হয়।
প্রথম পরার্ধে একে "ব্রাহ্মকল্প" বলার কারণ হলো, তখন ব্রহ্মাজীর জন্মকাল। আর দ্বিতীয় পরার্ধে ব্রহ্মা যখন সুপ্তাবস্থা থেকে জাগ্রত হন তখন তিনি পৃথিবীকে জলমগ্ন দেখিয়া চিন্তিত হইলে, ভগবান বরাহদেবের আবির্ভাব ঘটে থাকে তাই এর নাম হয় "বারাহ-কল্প"।
অর্থাৎ সকল শ্বেত-কল্পকেই "ব্রাহ্মকল্প" কিংবা "বারাহ-কল্প" নামে অভিহিত করা যায় না। কেবলমাত্র প্রথম পরার্ধের ১ম কল্প এবং দ্বিতীয় পরার্ধের ১ম কল্পকেই উক্ত দুটি নামে অভিহিত করা যায়।
"বর্তমান কল্পের নাম বারাহ-কল্প বা শ্বেতবরাহ-কল্প। মৎস্য পুরাণে বারাহ নামে অন্য একটি কল্পের উল্লেখ থাকলেও, অধিকাংশ শাস্ত্রমতে- দ্বিতীয় পরার্ধের ১ম কল্প চলমান থাকায় শ্বেত-কল্পই বর্তমানের 'বারাহ-কল্প' বলে বিবেচনা করতে হবে"— ইতি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।।

অয়ং তু কথিতঃ কল্পো দ্বিতীয়স্যাপি ভারত।
বারাহ ইতি বিখ্যাতো যত্রাসীৎ শূকরো হরিঃ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত: ৩/১১/৩৭)

অনুবাদ:- হে বিদুর! বর্তমানে যে কল্প চলছে তাকে দ্বিতীয় পরার্ধের প্রারম্ভ বলা হয়। এই কল্প বারাহকল্প নামে বিখ্যাত, এই কল্পে ভগবান হরি শূকররূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।
প্রতিটি পুরাণ আলাদা আলাদা কল্পের ঘটনাবলি অনুসারে বর্ণিত। তাই পুরাণভেদে একই ঘটনার ভিন্নতা দৃষ্ট হয়ে থাকে। বর্তমান কল্পের নাম শ্বেত-বরাহ কল্প। কল্পভেদে পুরাণ সংখ্যা এবং পুরাণসমূহের নামেরও ভিন্নতা দেখা যায়।

কোন পুরাণে কোন কল্পের ঘটনাবলি লিখিত হয়েছে?

এ বিষয়ে আংশিক তথ্য পাওয়া যায় মৎস্য পুরাণ এবং স্কন্দপুরাণে; যা জানার মাধ্যমে একেক পুরাণের ঘটনার সাংঘর্ষিকতা, মতবিরোধ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সংশয় দূর হবে।

• বুধগণ পদ্ম-কল্পের ঘটনা সম্বলিত পুরাণকে পদ্ম পুরাণ বলে কীর্ত্তন করেন।
(মৎস্য পুরাণ: ৫৩/১৪)
(স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ২/৩০)

• যে পুরাণে বায়ুদেব, শ্বেত-কল্প প্রসঙ্গে ধর্ম্ম সকল ব্যাখ্যা করেন তাকে বায়বীয় পুরাণ বলা হয়। এই পুরাণ রুদ্র মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ।
(মৎস্য পুরাণ: ৫৩/১৮)

• অন্যদিকে স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ২/৩৫ এ একে "শ্রুতকল্প" এর ঘটনাবলম্বনে রচিত পুরাণ বলা হয়েছে।
যে পুরাণের নারদ বৃহৎ-কল্প সম্বন্ধীয় নানা বিষয় বিবৃত করিয়াছেন, সেই পুরাণ নারদীয় পুরাণ বলে অভিহিত।
(মৎস পুরাণ: ৫৩/২৩)
(স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ২/৪৩)

• পুরাকালে অগ্নিদেব বশিষ্ঠের নিকট ঐশান-কল্পীয় বৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া যে পুরাণ কীর্ত্তন করেন তাকে আগ্নেয় বা অগ্নি পুরাণ বলা হয়।
(মৎস্য পুরাণ: ৫৩/২৮)
(স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ২/৪৭)

• ব্রহ্মা যাহাতে আদিত্য মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া অঘোর-কল্পীয় বৃত্তান্ত মনুর নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভবিষ্য পুরাণ।
(মৎস্য পুরাণ: ৫৩/৩০)

(স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ২/৪৯)

• রথন্তর কল্পের বৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া সাবর্ণী মনু নারদের নিকট কৃষ্ণমাহাত্ম্য সম্বলিত যে পুরাণ কীর্ত্তন করেন, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।
(মৎস পুরাণ: ৫৩/৩৩-৩৪)
(স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ২/৫২)

• যাহাতে অগ্নি-লিঙ্গ মধ্যস্থিত দেব মহেশ্বর ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষার্থ অগ্নিসম্বন্ধীয় (আগ্নেয়-কল্প) বৃত্তান্ত বলিয়াছেন, তাহার লিঙ্গ পুরাণ নামে কথিত। ইহা কল্পান্তে স্বয়ং ব্রহ্মা কীর্ত্তন করিয়াছেন।
(মৎস পুরাণ: ৫৩/৩৬-৩৭)
(স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ২/৫৪)

• ভগবান বিষ্ণু মানব-কল্প প্রসঙ্গে মহাবরাহের মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া যাহা পৃথিবীকে বলিয়াছেন, তাহা বরাহ পুরাণ নামে কীর্ত্তিত।
(মৎস পুরাণ: ৫৩/৩৯)
(স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ২/৫৭-৫৮)

• ষন্মুখ মাহেশ্বর ধর্ম অবলম্বনে মাহেশ্বর-কল্পের বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় যে পুরাণ প্রণয়ন করেন, তাহা স্কন্দ পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ।
(মৎস পুরাণ: ৫৩/৪১)
(স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ২/৬০)

• কূর্ম্মরূপী ভগবান পাতালে লক্ষ্মী-কল্পের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে যে পুরাণ কীর্ত্তন করেন, তাহা কূর্ম পুরাণ।
(স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ২/৬৬-৬৭)

• ভগবান জনার্ধন কল্পারম্ভে শ্রুতিবৃত্তি বিধানার্থ সপ্তকল্পের বৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া মনুর নিকট যে পুরাণ কীর্ত্তন করেন, তাহা এই মৎস্য পুরাণ।
(মৎস পুরাণ: ৫৩/৪৯)
(স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ২/৭০)

• গরুড় পুরাণ গারুড়-কল্পের পুরাণ।
(মৎস পুরাণ: ৫৩/৫২)
(স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ২/৭২)

• পূর্বকালে বায়ু শ্বেত-কল্প প্রসঙ্গে শিব পুরাণ বর্ণনা করেছিলেন।
(শিব পুরাণ, বায়বীয় সংহিতা, পূর্বখণ্ড: ১/২৩)
কল্পভেদে কখনও কখনও এক কল্পের মহাপুরাণ আরেক কল্পের উপপুরাণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ কারণেই গরুড় পুরাণ, কূর্ম পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, শিবপুরাণ এ বর্ণিত পুরাণের তালিকায় ভিন্নতা দৃষ্ট হয়।
তাহলে বর্তমান শ্বেত-বরাহ কল্পের পুরাণ কোনগুলো?

বারাহকল্পবৃত্তান্তমধিকৃত্য পরাশরঃ।
যৎ প্রাহ ধর্মানেখিলাংস্তদ্যুক্তং বৈষ্ণবং বিদুঃ।।

(মৎস্য পুরাণ: ৫৩/১৬)

অনুবাদ: মহর্ষি পরাশর বারাহ কল্পের বৃত্তান্তের আশ্রয় নিয়ে যে সম্পূর্ণ ধর্মের বর্ণন করেছেন, সেই পুরাণই বৈষ্ণব পুরাণ বা "বিষ্ণু পুরাণ" বলিয়া বিদিত।।
স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড: ২/৩২ এও বৈষ্ণব পুরাণকেই বারাহ-কল্পের পুরাণ বলা হয়েছে।

ব্যাসদেবের পিতা মহর্ষি পরাশর এই বিষ্ণু পুরাণসংহিতার রচয়িতা। মহামুনি ব্যাস, পুরাণ সংহিতা রচনা করিয়া তার শিষ্য সূতজাতীয় রোমহর্ষণকে তা অধ্যয়ন করাইলেন। রোমহর্ষণের ৬ জন শিষ্য। সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রষু, শাংশপায়ণ (হয়তো বৈশম্পায়ন), অকৃতব্রণ (পরশুরামের শিষ্য ও অনুচর) এবং সাবর্ণি (ভৃগুবংশীয় পৌরাণিক)।

কাশ্যপ, শাংশপায়ণ ও সাবর্ণি এই ৩ জন সংহিতাকর্ত্তা অর্থাৎ রোমহর্ষণ হইতে প্রাপ্ত মূল সংহিতা অবলম্বনে, প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণ সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। হে মুনি মৈত্রেয়! ঐ চারটি সংহিতার সার গ্রহণ করিয়া আমি পরাশর এই বিষ্ণুপুরাণ সংহিতা রচনা করিয়াছি। (বিষ্ণুপুরাণ: ৩/৬/১৬-২০)
মতান্তরে শ্রীসূত বলেন, ব্যাস হতে রোমহর্ষণ যে পুরাণ সংহিতা প্রাপ্ত হন, তা তিনি ৪ ভাগে বিভক্ত করেন। অতঃপর ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, বৈশম্পায়ন, অকৃতব্রণ এবং হ্যরীত এই ৬ জন রোমহর্ষণের কাছ থেকে এক একটি ভাগ শিক্ষা লাভ করেন। তাদের সাথে একত্রে রোমহর্ষণের পুত্র আমিও [শ্রীসূত গোস্বামী] পুরাণ শিক্ষা লাভ করেছিলাম। (শ্রীমদ্ভাগবত: ১২/৭/৫-৭)
এখানে শিষ্যদের নামের ভিন্নতা রয়েছে। তো সেই বিষয়ে আমি সন্দেহ প্রকাশ করছি না। একজনের একাধিক নাম থাকতেই পারে। সে যাই হোক। এখন আমরা এটুকু বুঝলাম যে, বিষ্ণু পুরাণে যে মহাপুরাণের তালিকা পাওয়া যায় সেই পুরাণসমূহই বর্তমান কল্পের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে; এটাই পৌরাণিক সিদ্ধান্ত।

আদ্যং সর্বপুরাণেনাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।
অষ্টাদেশ পুরাণোনি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে॥
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
অথান্যন্নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্।
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা॥
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদেশং স্মৃতম্।
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদেশম্॥
চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্॥

[বিষ্ণুপুরাণ: ৩/৬/২১-২৫]



অনুবাদ: ব্রাহ্মপুরাণ সমুদয় পুরাণের আদি বলে কীর্ত্তিত। পুরাণবিৎ ব্যক্তিরা বলেন— পুরাণসকল অষ্টাদশ সংখ্যায় বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম ব্রহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম ভাগবতপুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয়পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম অগ্নিপুরাণ, নবম ভবিষ্যপুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, একাদশ লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ বরাহপুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দপুরাণ, চতুর্দশ বামনপুরাণ, পঞ্চদশ কূর্মপূরাণ, ষোড়শ মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গরুড়পুরাণ এবং অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।
পুরাণের নামসমূহের হুবহু একই তালিকা বিষ্ণু ভাগবতেও পাওয়া যায়। যথা:

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয় ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতম্।।
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কেন্ডেয়ং সবামনম্।
বরাহ্যং মাৎস্যং কৌর্মং চ ব্রহ্মাণ্ডেখ্যমিতি ত্রিষট্।।

[শ্রীমদ্ভাগবত: ১২/৭/২৩-২৪]

অনুবাদ: ১৮ টি মুখ্য পুরাণ হচ্ছে- ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, শিব পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, গরুড় পুরাণ, নারদ পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বামন পুরাণ, বরাহ পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, কূর্ম পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।
বর্তমান বারাহ-কল্পের ঘটনা সম্বলিত পুরাণ না হলেও, কোনো এক শ্বেত-কল্পের পুরাণ হওয়ায় শিবপুরাণে প্রাপ্ত পুরাণের তালিকাও বিষ্ণুপুরাণের সাথে অভিন্ন।

দশধা চাষ্টধা চৈতত্পুরাণমুপদিশ্যতে।
বৃহত্সুক্ষ্মপ্রভেদেন মুনিভিস্তত্ত্ববিত্তমৈঃ।।
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং চ শৈবং ভাগবতং তথা।
ভবিষ্যং নারদীয়ং চ মার্কণ্ডেয়মতঃ পরম্।।
আগ্নেয়ং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গং বারাহমেব চ।
স্কান্দং চ বামনং চৈব কৌর্মং মাৎস্যং চ গারুড়ম্।।
ব্রহ্মাণ্ডং চেতি পুণ্যোহয়ং পুরাণানামনুক্রমঃ।

[শিব পুরাণ, বায়বীয় সংহিতা, পূর্বখণ্ড: ১/৪২-৪৫]

অনুবাদ: তত্ত্বদর্শী মুনিগণ স্থূল-সুক্ষ্ম ভেদে পুরাণের সংখ্যা ১৮ বলে থাকেন। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, শিব পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, নারদীয় পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, বরাহ পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বামন পুরাণ, কূর্ম পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, গরুড় পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ- এটা পুরাণসমূহের পুণ্যপ্রদ অনুক্রম।

তাই এই বারাহ-কল্পে উক্ত তালিকার বাহিরে যেসব পুরাণ পাওয়া যায়, সেই সমস্তই উপপুরাণ বা গৌণ পুরাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এগুলোর মধ্যে কিছু উপপুরাণ ব্যাসদেব কর্তৃক লিখিত বলে মান্য করা হলেও অনেকগুলোই ব্যাসদেবের পরবর্তীতে তার শিষ্যগণ কিংবা বিভিন্নজন কর্তৃক লিখিত হয়েছে। একারণে ও শাস্ত্র বিচারের ক্রম অনুযায়ী উপপুরাণ গুলোর ততটুকু অংশই প্রামাণিক ধরতে হবে, যতটুকু অংশ মহাপুরাণের সাথে অবিরোধী।



শ্বাসজপ ও মধুভক্ত

ডা. শৈবাল বসাক

শ্রীমদভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত করেছেন। জপ তিনভাবে করা যায়; উচ্চস্বরে, যা অপরে শুনতে পায়, নিম্নস্বরে, যা শুধু জপকারী নিজে শুনতে পায় এবং মানস জপ, যা মনে মনে করা হয়। জপ, দিবসের একটা নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু শ্বাসজপ? সেটা আবার কী?

শ্বাস গ্রহণ করাকে বলা হয় প্রশ্বাস এবং শ্বাস ত্যাগকে বলা হয় নি:শ্বাস। এই প্রশ্বাসে-নিশ্বাসে ইষ্টদেবতার নাম জপ করাকে বলে শ্বাসজপ। নিশীথে নিদ্রা যাবার পূর্ব পর্যন্ত শ্বাসজপ সম্ভব। কারণ ঘুমের মধ্যে মানবের চেতনা লুপ্ত হয়। তাই বলে কি ঘুমের মধ্যে শ্বাসজপ অসম্ভব?

না, অসম্ভব নয়। জগতে হয়তো অনেক মহান ভক্ত আছেন যাঁরা অতীতে ঘুমের মধ্যেও শ্বাসজপ করেছেন, এখনও করেন, ভবিষ্যতেও করবেন। আমাদের বিক্রমপুরের সিরাজদিখান উপজেলার মধুভক্ত হচ্ছেন এই এলাকার চাক্ষুষ সেই মহান শ্বাসজপকারী।

আজ থেকে প্রায় ৭০-৮০ বছর আগে একবার কোন এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত এক পাঠক গোঁসাইয়ের কক্ষে মধুভক্ত শয়ন করেন। সকালে পাঠক গোঁসাই গৃহকর্তাকে জিজ্ঞেস করেন, "আমার কক্ষে গতকাল যিনি ঘুমিয়েছেন, তিনি কে?!" গৃহকর্তা ভীত হয়ে প্রতিপ্রশ্ন করলেন, "গুরুদেব, তিনি কি আপনার প্রতি কোন অপরাধ করেছেন?"

উত্তরে গুরুদেব বলবেন, "আরে না, না। আমি তো সারা রাত ঘুমাইনি। আমি শুধু এই মহান ভক্তের শ্বাসজপ করা শুনেছি ও দেখেছি। কী ভয়ংকর ব্যাপার! তিনি ঘুমের মধ্যেই প্রতি প্রশ্বাসে বলছেন, 'জয় নিতাই!' আর প্রতি নি:শ্বাসে বলছেন, 'জয় গৌর!' এও সম্ভব!" প্রণাম হে মধুভক্ত।

যাঁরা শ্বাসজপ করেন, তাঁদের পক্ষে একটা মূহুর্তও ভগবানকে ভুলে থাকা সম্ভব নয়। তাঁরাই অতিধন্য, ভগবানের অতি কৃপার পাত্র। অন্তত জাগ্রত অবস্থায় আমরাও কি শ্বাসজপ করতে পারি না?



শ্রী টোকানি প্রসাদ পাল ভক্ত কথা

ডা. শৈবাল বসাক

প্রয়াত শ্রী টোকানি প্রসাদ পাল ছিলেন কামিনী পালের বাড়ি, পাইকপাড়া, আব্দুল্লাহপুর, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জে সে বাড়ির ভূস্বামী। তিনি ভগবানের মহান ভক্ত ছিলেন। তাঁর ইষ্টদেব হলেন শ্রী শ্রী রাধেশ্যাম। তিনি ইষ্টদেবকে নৈবদ্য নিবেদন করে দিবসে একবার প্রসাদ আস্বাদন করতেন, তিনি একাহারী ছিলেন।

তিনি কখনও কথার বরখেলাপ করতেন না। একদিন তিনি নিমন্ত্রণ খেতে যাবেন, প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি। কিন্তু তিনি তো নিমন্ত্রণকারীকে কথা দিয়েছেন যে, তিনি যাবেন। তাই সেই প্রবল ঝড়বৃষ্টিতেই তিনি রওয়ানা দিলেন। ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করেই তিনি নিমন্ত্রণদাতার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। বাকি শুধু সম্মুখস্থ একটি খাল পার হওয়া। কিন্তু এই প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টিতে তীরে কোন নৌকাই নেই! আবার সাতার কেটে খাল পাড়ি দেয়ার মতো অবস্থাও নেই।

শ্রী টোকানি প্রসাদ পাল মনে মনে শ্রী শ্রী রাধেশ্যামকে স্মরণ করে বললেন, 'হে রাধেশ্যাম, তাহলে কি আজ কথার বরখেলাপ হবে!? খাল পার হতে না পেরে অগত্যা নিমন্ত্রণ রক্ষা না করেই বাড়ি ফিরে যেতে হবে?!...' মনে মনে তিনি রাধেশ্যামের সাথে এরকম বাক্যালাপ করছেন, এমন সময় তীরে এক বুড়ো মাঝি নৌকাসমেত হাজির হয়ে ডেকে উঠলেন, "বাবু, নৌকায় উঠুন।" পালবাবু নৌকায় উঠলেন। বুড়ো মাঝি নৌকা বেয়ে পালবাবুকে খালের ওপারে পৌঁছে দিলেন। তিনি নৌকা থেকে নেমে পাঞ্জাবির পকেট থেকে নৌকাভাড়া বের করে মাঝিকে ভাড়া দিতে পিছন ফিরে দেখেন, মাঝিও নেই, নৌকাও নেই!

তাহলে কি রাধেশ্যামই মাঝিরূপে উপস্থিত হয়ে পাল মহাশয়কে খাল পার করে দিলেন!? তাই তো মনে হয়। যিনি তাঁর ভক্তের জীবনতরীই পার করে দেন, তাঁর পক্ষে এই ক্ষুদ্র খাল পার করে দেয়া কীই বা বড় ব্যাপার! তবে ভগবানের এরকম সাক্ষাৎ কৃপা পাওয়ার জন্য শ্রী টোকানি প্রসাদ পালের মতো মহান ভক্ত হতে হয়।

আমার সৌভাগ্য যে, শ্রী টোকানি প্রসাদ পালের পুণ্য বসতভিটায় বসবাস করতে পারছি। এমন ভক্তকে বারবার প্রণাম। সকলেই যেন তাঁর মতো মহান ভক্ত হতে পারেন, এটাই প্রার্থনা।





শ্রী শ্রী চণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্য – দেবী কৃপা লাভের অকল্পনীয় সোপান

শ্রী সুকান্ত চক্রবর্তী

বাঙালি সনাতনী হিন্দুদের জীবনে দুইটি অমোঘ গ্রন্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। একটি শ্রী শ্রী গীতা ও অপরটি শ্রী শ্রী চণ্ডী। সর্ব্বোপনিষদ মন্থন করে দুগ্ধ স্বরুপ শ্রী গীতা আমাদের জ্ঞান,ভক্তি,কর্ম যোগের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনার পথ দেখায়। অপরদিকে তন্ত্র সমুদ্রের গুহ্য তত্ত্ব নিয়ে দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনে শ্রী শ্রী চণ্ডীর প্রকাশ। মানবজাতির আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক বাধা বিঘ্ন নাশ করে কিভাবে দেবী মহামায়ার কৃপাশক্তি তে ব্রহ্মত্ত্ব লাভ করা যায়-- তার দিক নির্দেশকই হলো শ্রী শ্রী চণ্ডী।

অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন– শ্রী শ্রী চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ মাত্র। এটি একটি ভ্রমিত উপলব্ধি। বস্তুত, আগম-নিগম-যামল-তন্ত্র ইত্যাদির অঙ্গীভূত হয়ে শ্রী শ্রী চণ্ডী "সর্ব্বতন্ত্রসার" নামে সমাদৃতা।

স্ত্রী লিঙ্গে ঈপ এর সাথে "চণ্ড" প্রত্যয় যোগে =চণ্ডী, যার অর্থ "পরব্রহ্মমহিষী" বা "আদিশক্তি"। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিন শক্তির ত্রিগুণাভূতা বলে "শ্রী শ্রী চণ্ডী" ত্রিগুণাত্মিকা। এই তিন শক্তির প্রকাশ প্রদর্শন করেই শ্রী শ্রী চণ্ডী কে তিনটি চরিত্রে বিভক্ত করা হয়েছে– মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। যারা শ্রী শ্রী চণ্ডীর প্রথম, মধ্যম ও উত্তর চরিতের দেবতা।

আর্য ঋষিগণ এই তিন শক্তি কে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "স্বাভাবিকী-জ্ঞানবল-ক্রিয়া" চ নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ, ব্রহ্মাণ্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়া, জ্ঞান ও শক্তি এই তিনগুণ অবলম্বন করে শ্রী শ্রী চণ্ডীই বিশ্বব্যাপিনী ও সৃষ্টি -স্থিতি-প্রলয়ের শক্তিরুপিণী। আর তন্ত্র বরিষ্ঠদের মতে মহাকালী আনন্দরূপা, মহালক্ষী সদরূপা এবং মহা সরস্বতী চিদরূপা।

শ্রী শ্রী চণ্ডীর প্রথম চরিতে শ্রী বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে সৃষ্ট মধু কৈটভ অসুরদ্বয় কে বিনাশের জন্য ত্রিলোকবাসী দেবী মহাকালীর স্তব করছেন। তিনিই সৃষ্টির আদিতত্ত্ব, তিনিই ইচ্ছাশক্তি স্বরূপা। শ্রী শ্রী চণ্ডীর মধ্যম চরিতে দেবগণের তেজোরাশি হতে মহীয়সী নারী মূর্তির আবির্ভাব - যিনি ক্রিয়া শক্তি স্বরুপা মহালক্ষী। আর উত্তর চরিতে শুম্ভনিশুম্ভ বধের অধিষ্ঠাত্রী ত্রিজগৎ-ধারিণী দেবী মহাসরস্বতী -- তিনিই দেবী চণ্ডীর জ্ঞান রুপ মহাশক্তির প্রকাশ।

শ্রী শ্রী চণ্ডী মূলত শ্রুতিপ্রস্থান। কৃষ্ণযজুর্বেদের উত্তরীয় আরণ্যকের নারায়ণোপনিষদে বলা হচ্ছে–

তমগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।।

অর্থাৎ, আমি সেই বৈরোচনী, অগ্নিবর্ণা,স্বীয় তাপে শত্রুদগ্ধকারিণী কর্ম্মফল দায়িণী দুর্গা দেবীর শরণ গ্রহণ করি। হে সুতারিণী, হে সংসার ত্রাণকারীণী মহাদেবি !আপনাকে প্রণাম করি।
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে মৈত্রায়ণী সংহিতায় দেবী দুর্গার গায়ত্রী হলো -

কাত্যায়নৈ বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।

এই প্রসঙ্গে ভুবনেশ্বরী সংহিতা বলছে– "যথা বেদো অনাদির্হি তথা সপ্তশতীস্তব"। অর্থাৎ, বেদ যেমন অপৌরুষেয় বা অনাদি, শ্রী শ্রী সপ্তশতমন্ত্রাত্বক চণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্যও তেমনি অপৌরুষেয় বা অনাদি। বেদের মতো শ্রী শ্রী চণ্ডীও ত্রয়ী। তার প্রথম চরিত ঋগ্বেদ স্বরূপা, মধ্যম চরিত যজুর্বেদ স্বরূপা ও উত্তর চরিত সামবেদ স্বরূপা। যা যথাক্রমে গায়ত্রী, উষ্ণীক ও অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত।
শ্রী শ্রী চণ্ডী সৃষ্টির দ্বিতীয় মনু "স্বরোচিষ মনু" র সময়কালেই রচনা হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। কারণ স্বরোচিষ এর পুত্র রাজা চৈত্রের বংশে রাজা সুরথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজ্যহারা হওয়া এবং দেবীর আরাধনা তে হৃত রাজ্য ফিরে পাওয়ার কথাই শ্রী শ্রী চণ্ডী তে "দেবীমাহাত্ম্য" হিসেবে স্থান পেয়েছে। দেবীমাহাত্ম্যের শ্লোক সংখ্যা ৫৭৮ হলেও কাত্যায়নী তন্ত্রে শ্লোকগুলোকে পূর্ণ, অর্ধ, পাদ, পাদার্ধ রুপে ভাগ করে এবং মার্কণ্ডেয় উবাচ ইত্যাদি গদ্যাংশ কেও পৃথক পৃথক মন্ত্র ধরে ৭০০ শ্লোকে বিভক্ত করা হয়েছে। তাই শ্রী শ্রী চণ্ডী "সপ্তশতী"।
এই প্রসঙ্গে কাত্যায়নী তন্ত্রের বচন টি হলো---

অষ্টসপ্তত্যুত্তরানাং শ্লোকানাং শতপঞ্চকম্।
প্রোক্তং সপ্তশতী স্তোত্রং তৎ সপ্তশত সংখ্যয়া"।।
এবং ত্রয়োদশাধ্যায়োঃ হোমপূজন তৃপ্তিষু।
শতানি সপ্তসংখ্যানি তব প্রোক্তানি শৈলজে।।

অর্থাৎ, হে পর্বতকন্যে, শ্রী শ্রী চণ্ডীর তেরটি অধ্যায়ে পূজা, হোম ও তর্পণের জন্য তোমার সাতশত মন্ত্র উক্ত হয়েছে।

শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠের অধিকারী নির্ণয়:

শ্রী শ্রী চণ্ডী "মন্ত্রাত্বক", যেখানে শ্রী শ্রী গীতা "শ্লোকাত্মক"। তাই উপনীত হওয়ার পরে শ্রী শ্রী গীতা ত্রিজাতি পাঠ করতে পারলেও শ্রী শ্রী চণ্ডী কিন্তু শুধু উপনীতরা পাঠ করতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্ম পুরাণের বচনানুসারে "ব্রাহ্মণ" জন্ম মাত্রই শাক্ত এবং শাক্তবীজ সমূহ উচ্চারণ এর অধিকারী। তাই,উপনীত ব্রাহ্মণ সন্তান নিজের জন্য সংকল্পিত পাঠ করতে পারে। কিন্তু অন্যের জন্য পাঠ করতে গেলে তারও শক্তিদীক্ষা প্রয়োজন। আর অন্য দ্বিজাতি গণের নারী ও পুরুষ গণ শক্তি দীক্ষা গ্রহণ করে দেবী মাহাত্ম্য পাঠ করতেই পারেন নিজেদের জন্য। কিন্তু তাঁরা অপরের জন্য (পরার্থে) চণ্ডী পাঠে অধিকারী নন। এই প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা বলছে--

যথা ব্যাঘ্রী হরেৎ পুত্রাণ দ্রংষ্টাভির্নচ পীড়য়েৎ
ভীতাপেতন ভেদাভ্যাং তদ্বদবর্ণানে প্রযোজেয়েৎ।
মধুরং চ ন বাচকং ব্যক্তং চাপি ন পীড়িতম্।
সনাথস্যেব দেশস্য ন বর্ণাঃ সঙ্করগতা।।

অর্থাৎ, ব্যাঘ্রী যেমন নিজের শিশু সন্তান কে মুখে করে অন্যস্থানে নিয়ে যায় কিন্তু তার গায়ে দাঁতের আঘাত লাগেনা ,সে পড়ে যায় না সেরূপ মান্ত্রিক বর্ণ এমনভাবে উচ্চারণ করতে হবে, যাতে তা শিথিল বা কর্কশ না হয়। সুশাসন যেমন বর্ণসংকর রোধ করে, তেমনি মন্ত্রের পাঠক ও তার মর্যাদা রক্ষা করবে।
মন্ত্রমহোদধিতে বলা হয়েছে --

স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা বৃণুয়াদ ত্রিজাত্যো দশবাড়বান।
জিতেন্দ্রিয়ান সদাচারান কুলীনান সত্যবাদীনঃ।
ব্যুৎপন্নাংশ্চ চণ্ডী পাঠরতান লজ্জাদয়াবেতঃ।।

অর্থাৎ, জিতেন্দ্রিয়, সদাচারী, কুলীন, সত্যবাদী, শাস্ত্রজ্ঞ, লজ্জাশীল, দয়াবান ও চণ্ডী পাঠে অভ্যস্থ ব্যক্তিকেই চণ্ডী পাঠে বরণ করা উচিত।



সাধারণত তন্ত্রশাস্ত্র মতে, পূর্ণাভিষেক এর সময় আত্মশ্রাদ্ধ সম্পন্নকারী ব্যক্তি তাঁর পূর্বোক্ত বর্ণাশ্রম ত্যাগ করেন, অর্থাৎ তাঁর পূর্বোক্ত বর্ণাশ্রম আর থাকেনা। এই রূপ ব্যক্তি অবশ্যই পরার্থে শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠ এর অধিকারী। তবে খেয়াল রাখতে হবে উপরে বিবৃত মন্ত্রমহোদধি অনুযায়ী যে গুণাচার বর্ণিত হয়েছে – তা সেই ব্যক্তির রয়েছে কিনা! যদি থেকে থাকে, তবেই সেই ব্যক্তিকে শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠের জন্য বরণ করা উচিত। আর তন্ত্র শাস্ত্র পুরুষ ও নারীকে বিভেদ করেনা বলে উক্ত গুণসম্পন্না নারীও পরার্থে শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠ করতে পারেন।

অনেক কে দেখা যায় ঠেস বা হেলান দিয়ে, হাই তুলে, থুথু ফেলে, অন্যমনস্ক হয়ে শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠ করতে বসে যান। এটি একদম অনুচিত। এই প্রসঙ্গে ভুবনেশ্বরী তন্ত্রে দেবাদিদেব বলছেন–

ন মানসং পঠেৎস্তোত্রং বাচিকংতু প্রসশ্যতে।
অনুক্রমং পঠেদ্দেবি শিরঃকম্পাদিকং ত্যজেৎ।
যদি প্রমাদাদধ্যায় মধ্যে চ বিরমেৎ প্রিয়ে।
পুনরধ্যায়মারভ্য পঠেৎ সর্ব্বস্তরে বিধিঃ।।

যেহেতু শ্রী শ্রী চণ্ডী মন্ত্রাত্বক এবং মন্ত্র পাঠ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা তে বলা হয়েছে –

মন্ত্র শীঘ্রী শিরঃকম্পী স্বয়ং লিখিত পাঠক।
অনর্থজ্ঞোহল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমঃ।।

অর্থাৎ, যে গান করে,দ্রুত পাঠ করে, পাঠের সময় মস্তক নাড়ে, ক্ষীণকণ্ঠে পাঠ করে, নিজ হস্তলিখিত মন্ত্র পাঠ করে, অর্থ জানেনা – সে মন্ত্রের অতি অধম পাঠক। এই বচনানুযায়ী এই দোষগুলো রহিত পাঠক ই উত্তম শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠক।

• এখন অনেকের Confusion বা বিড়ম্বনা হতে পারে এটা ভেবে যে -- তাহলে ছাপা অক্ষরে শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠ দোষনীয় কিনা। উত্তরে বারাহী তন্ত্র বলছে–

স্বয়ঞ্চ লিখিতং যচ্চ কৃতিনা লিখিতং ন যৎ।
অব্রাহ্মণেণ লিখিতং তচ্চাপি বিফলং ভবেৎ।।

অর্থাৎ, যা, নিজের লেখা, অপণ্ডিত এর লেখা এবং অব্রাহ্মণ এর লেখা – সেই পাঠ নিষ্ফল।
খড়্গমালা তন্ত্রোক্ত বচনানুসারে—

লেখন্যা লিখিতং বিপ্রৈর্মুদ্রাভিরঙ্কিতঞ্চ তৎ।
শিল্পাদি নির্মিতং যচ্চ পাঠ্যধার্যঞ্চ সর্বদা।।

অর্থাৎ, বিদ্বান বিপ্র দ্বারা লিখিত, মুদ্রা দ্বারা অঙ্কিত, শিল্প সম্মত গ্রন্থ সর্ব্বদা পাঠ্য ও গ্রহণীয়।

• এখন কথা হলো অদিক্ষীত কি তবে শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠ করতে পারেনা? অদীক্ষিত কি চণ্ডী পাঠ করতে পারে? এর উত্তর হচ্ছে - না, স্পষ্ট ভাবেই পারে না।

শ্রীগুরু সময়দীক্ষাকালে শিষ্যকে পুরাণ পাঠের অধিকার দিয়ে শিষ্যের ভক্তি সংস্কার করেন। শ্রী শ্রী চণ্ডীপাঠ এই ভক্তিসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। বৈদিক ব্রাহ্মণদের বেদ পারায়ণের শেষে পুরাণ দীক্ষা হয়(হতো)। যাতে বেদের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো বিশিষ্ট পুরাণ স্বশাখা পারায়ণের নির্দেশ রয়েছে। যেমন শৈব মতে বেদ ও আগম পারায়ণের পর শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণের পারায়ণ করতে হয়। পাঞ্চরাত্রে দীক্ষার পর বেদ ও আগম পারায়ণের পর



শ্রীমদ্ভাগবত দীক্ষা হয়। রামায়েতদের মধ্যে রামায়ণ দীক্ষা হয়। গাণপত্যে মুদগল পুরাণ ও গণেশ পুরাণ পারায়ণের জন্য বিশেষ দীক্ষা নিতে হয় - উপনীত ব্রাহ্মণ ও অন্য দ্বিজাতি ও এই মন্ত্র সংস্কার ভিন্ন পুরাণে (শ্রী শ্রী চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত) অধিকারী হয় না। শাক্ত, চণ্ডী পাঠের জন্যও তাই শাক্ত দীক্ষা আবশ্যক। আর যারা পাঠের অধিকারী নন সেই অন্য জাতি পাঠ শুনলেও দেবীর কৃপা লাভের অধিকারী হবেন।

শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠের শুরুতে বৈদিক দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত, অর্গল স্তোত্র, কীলকস্তব ও দেবীকবচ যথাক্রমে পাঠ করে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করতে হয় এবং শেষে রহস্যত্রয় পাঠ করতে হয়। কুব্জিকা তন্ত্রে এর সাথে সাথে কুঞ্জিকা-স্তোত্রও পাঠ করতে বলা হয়েছে।

কবচং নার্গলস্তোত্রং কীলকং ন রহস্যকম্।
ন সূক্তং নাপিধ্যানং চ ন ন্যাসং ন ভ বার্চনম্।।

অর্থাৎ, দেবীকবচ, অর্গলস্তোত্র, কীলকস্তব, রহস্যত্রয়, দেবীর ন্যাস, ধ্যান বা পূজা পাঠ না করেও যদি "কুঞ্জিকাস্তোত্র" পাঠ করা হয় তাহলেও চণ্ডী পাঠের ফল লাভ হয়।

এইক্ষেত্রে কলির স্মার্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধীর বিধান অনুযায়ী দেবীসূক্ত, অর্গল, কীলক, কবচ, ঋষ্যাদি, দেবীমাহাত্ম্য ও রহস্যত্রয় -- এই ক্রমানুসারে পাঠ ই বিধেয়। এই ছয়টিকেই কাত্যায়নী তন্ত্রে ষড়ঙ্গ বলা হয়েছে এবং এগুলো পাঠ ছাড়া শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠ নিষ্ফলা বলা হয়েছে।

জয় ভবানী। 🌺🙏

শ্রী দুর্গার্পনমস্তু।🌺🙏



নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

স্নেহা গাইন

'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু' নামটা শুনলেই আমাদের শরীরের ভিতরে বয়ে যায় এক শ্রদ্ধা এবং সাহসের স্রোত। এই নামটা উচ্চারণের সাথে সাথেই আমাদের চোখের সামনে যে বীর নেতা দেশপ্রেমিকের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে তিনি যদি না থাকতেন তাহলে হয়তো আজও ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাতে পরাধীন থাকতো। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতায় এবং ভারতের একতা, অখণ্ডতা রক্ষায় এবং সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল নিষ্কলুষ প্রতীক হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুর সমকক্ষ দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আর কেউ নেই, এই কারণেই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদ, অঞ্চলিকতাবাদ, ভ্রষ্টাচার ও জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির আধিপত্য। তাঁকে অস্বীকার করে লোকসান হয়েছে আমাদেরই, ভারতের নতুন রাষ্ট্র গঠনে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক বড় ফাঁক থেকে গিয়েছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কমবেশি সবারই জানা কিন্তু আজ তাঁর প্রথম জীবনের একটি স্বল্প চর্চিত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করছি।

খুব ছোট বয়স থেকে সুভাষ আত্মউন্নতির চেষ্টা করতেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন — "একেবারে শৈশবের যে কথা আমার মনে পড়ে তা হলো নিজেকে নিতান্তই এক তুচ্ছ জীব বলে মনে হত।" শৈশবে তিনি পিতামাতার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশেষভাবে চাইতেন কিন্তু তা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন কারণ তাঁদের পরিবারটি ছিলো বিশাল বড় এবং পিতা মাতা দুজনেই ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। এবং এই ঘটনা পরবর্তীকালে তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক হয়।

পরিবারের অন্য সকলের মত প্রথমে তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কটকের প্রটেস্ট্যান্ট ইউরোপীয় স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। স্কুলটি বিলাতি ধারায় পরিচালিত হওয়ার কারণে ছোটবেলায় তাঁকে তাঁর মাতৃভাষা বাংলা শেখানো হয়নি এবং পরবর্তীকালে তিনি যখন রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন তখন তাঁর সম্পূর্ণ মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন হয়। ভারতীয় পরিবেশে তাঁর নিজের সম্পর্কে ধারণা উচ্চতর হয় এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি নিজের অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে উঠে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বাধিক নম্বর অর্জন করেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন। শিক্ষকদের মধ্যে যিনি সুভাষের মনে সর্বাধিক ছাপ রেখেছিলেন তিনি হলেন এই রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস। তিনি তাঁর বিকাশশীল ছাত্রের মনে "নৈতিক মূল্যবোধ" তৈরি করার চেষ্টা করেন। তিনি সুভাষকে শিখিয়েছিলেন মানবজীবনে অন্য সবকিছুর থেকে বেশি প্রয়োজনীয় হলো নৈতিক মূল্যবোধ, আরো বলেছিলেন প্রকৃতির সাথে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা। প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে যেন প্রকৃতি তাঁর সাথে কথা বলে। এই কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কোনো নদীর তীরে অথবা কোনো মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্তের আভায় ধ্যানে বসতেন। সুভাষচন্দ্রের বয়স যখন পনেরো তখন তাঁর জীবনে মানসিক দ্বন্দ্ব এবং কষ্টভোগের সূত্রপাত হয়। এই দ্বন্দ্বটি ছিলো জাগতিক ও পার্থিব জীবন এবং সাধারণ শারীরিক কামনা বাসনার সাথে তাঁর উন্নততর সত্তার সংঘাত। প্রকৃতি পূজা তাকে সহায়তা করলেও এই দ্বন্দ্ব সমাধানের ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট ছিলো না।

এই সময় তাঁর জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবেশ করেন যার ফলে তার চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি রচনাবলীর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেগুলি পড়া শুরু করেন। বিবেকানন্দ চর্চা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে নিজ মুক্তির জন্য কাজ করা এবং মানবসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। স্বামীজির আদর্শ ছিলো "জন্মভুমিই তাঁর পুজোর প্রতিমা।" প্রতিটি ভারতবাসীই তাঁর ভাই এবং লোকশক্তি উত্থানের ওপরেই ভারতের মুক্তি নির্ভর করছে। স্বামীজির এই অনুশাসন সুভাষ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে সুভাষের মন স্বামী বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সারকথা সম্পর্কে অবগত হন যে, কেবল ত্যাগের মাধ্যমে মুক্তি সম্ভব।

পারিবারিক বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যবর্তী অবস্থায় তিনি পরিবার থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করতেন, যোগ অভ্যাস সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি মনোযোগ সহকারে পড়তেন এবং গোপনে সেসব অনুশীলনও করতেন। কোনো সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের খবর পেলেই তিনি তাঁর দলকে নিয়ে সেখানে ছুটে যেতেন কিন্তু তেমন কাউকে না পাওয়ার কারণে তাঁর মনের মত গুরু পাওয়ার আশা অপূর্ণ থেকে যায়। স্কুল জীবনের শেষে কলকাতার এক দলের বার্তাবহ এক দূত তাঁর সঙ্গে কটকে দেখা করেন। সেই জনৈক ডাক্তারী ছাত্রের নেতৃত্বে তাদের দ্বিবিধ লক্ষ্য ছিলো আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং জাতির সেবা। সুভাষচন্দ্রের মন তখন যে মতবাদের দিকে যাচ্ছিলো এই লক্ষ্য দুটি তার সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো।

কটকে একবার ছুটির সময় একদল উৎসাহী ছেলের সঙ্গে সমস্ত বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে তিনি কলেরা মহামারীর কবলে আক্রান্ত মানুষের সেবার কাজে লেগে পড়েন। এই সময়তেই তিনি ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন – "এক সপ্তাহের অভিজ্ঞতা আমার চোখের সামনে এক নতুন জগত খুলে দিল এবং আসল গ্রামীণ ভারতবর্ষের একটি ছবি তুলে ধরল যে ভারতবর্ষে দারিদ্র্য সারাদেশকে গ্রাস করে বসে আছে, মানুষ মশামাছির মত মরে এবং নিরক্ষরতা সর্বব্যাপী।"

১৯১৩ সালে সুভাষ যখন কটক ছেড়ে কলকাতায় আসেন তখনও তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা এবং সমাজসেবা সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট ছিলো। এরপর তিনি একটি দলের সাথে যুক্ত হন যাদের বহুমুখী উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিলো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং জ্ঞানলাভের জন্য ভারতবর্ষের ধর্মস্থান এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে ভ্রমণ করা। এই সময় তিনি ঋষি অরবিন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চে অরবিন্দ যে চিন্তাধারা তুলে ধরেছিলেন তা সুভাষ এবং তাঁর দলের সকলের মনে গভীর রেখাপাত করে। এরপর অরবিন্দের রচনাবলী, দর্শন এবং যোগের সমন্বয় সর্বোপরি অরবিন্দের চিন্তাধারা সুভাষকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি এগুলো চর্চা করতে শুরু করেন।

যতদিন তিনি রাজনীতিতে সরাসরি যোগদান করেননি ততদিন পর্যন্ত তিনি ধর্মীয় শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করতেন এবং নানারকম সমাজসেবার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। কলেজের অধিকাংশ ক্লাসের বক্তৃতা তাঁর ভালো লাগতো না এজন্য পড়াশোনায় তিনি একপ্রকার অবহেলা শুরু করেন। পড়াশোনার বদলে তাঁর ভালো লাগতো বিতর্ক সভার আয়োজন এবং নানারকম স্থানে ভ্রমণ। এছাড়াও বন্যা এবং দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্যেও তিনি অর্থ সংগ্রহ করতেন। এইসময় থেকেই একদিকে প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে কঠিন দুঃখ - এই সামাজিক নীতির মধ্যে যে অন্যায় এবং অবিচার ছিলো তার প্রতি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

কটকে তাঁর স্কুলজীবনের শেষদিকের মতো কলকাতাতে কলেজ জীবনেও তিনি সাধু সন্ধান করে বেড়াতেন। আসলে ছোটবেলা থেকেই নেতাজীর মন আধ্যাত্মিক জগতের দিকে প্রভাবিত হতো এবং তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিলো জীবনে একজন আচার্য বা গুরু খুঁজে পাওয়া। এই জন্যই তিনি তপস্যাপরায়ণ সাধুদের সন্ধান করে তাঁদের সাথে দেখা করতেন এবং এনাদের মধ্যে অনেকেরই সরল জীবনযাত্রা অথচ উন্নত চিন্তাভাবনার কারণে তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করে। অবশেষে ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে একদিন ভোর হওয়ার আগে তিনি কাউকে কিছু না বলে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চুপচাপ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান। তাঁরা উত্তর ভারতের নানা তীর্থস্থান, ঐতিহাসিক স্থান এবং বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন। তখন সুভাষ অনেক আশ্রমে গিয়েছিলেন এবং বিশিষ্ট সাধুর সাথে দেখা করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এনাদের মধ্যে কেউই তাঁকে হিন্দুধর্মের মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করতে পারেননি বরং বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িকতা এবং ইংরেজদের আগ্রাসন দেখে তরুণ সুভাষের মনে আঘাত লাগে। বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণকালে বেনারসে রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের তাঁর দেখা হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সুভাষের পরিবারকে আগে থেকেই চিনতেন। তিনি সুভাষকে বলেছিলেন তাঁর কাজ সন্ন্যাসী



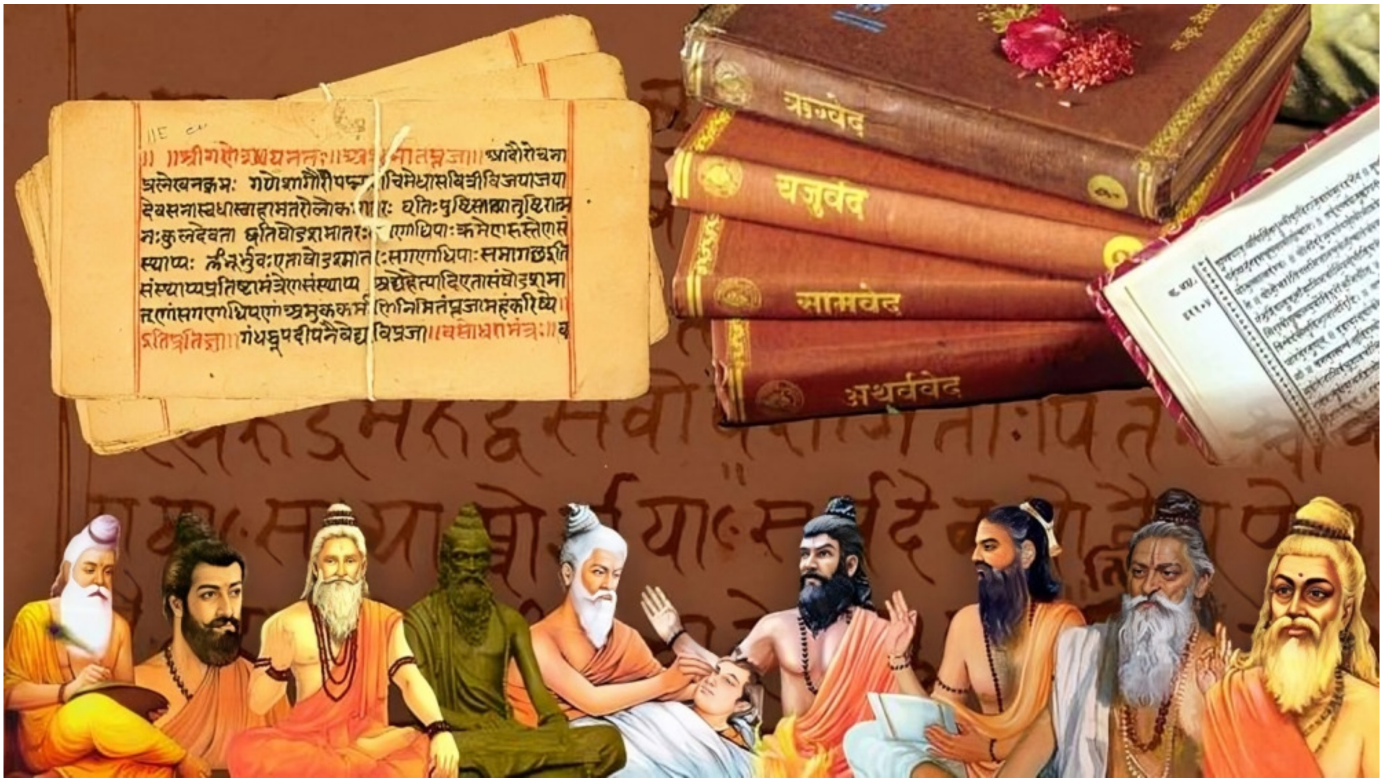
হওয়া নয় তাঁর কাজ দেশ উদ্ধার করা, দেশের মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। এরপর আরো অনেক ব্যক্তিবর্গের সাথে দেখা করার পর সুভাষের মনে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন এবং কর্ম সর্ম্পকে মোটামুটি একটা পরিষ্কার ধারণা চলে আসে। এদিকে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে প্রায় দুই সপ্তাহ তাঁর পিতা মাতা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা গভীর উদ্বেগের মধ্যে দিনযাপন করতেন। এই পরিস্থিতির মধ্যেই একদিন ভোরবেলা তিনি যেমন করে নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন তেমনি নিঃশব্দেই তিনি ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেন কলকাতায় ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার চরমে। তারা প্রতি পদে পদে ভারতীয়দের অপমান করতো অসম্মান করতো। রাস্তা ঘাটে, ট্রেনে, যানবাহনে সমস্ত জায়গায় তারা নিজেদের জাতিগত ঔদ্ধত্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করতো। এছাড়া বিনা দোষে ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার করতো এবং কোনো আইনও কোনো উপকারে লাগতো না। এইসব প্রত্যক্ষ করার পর সুভাষের মনে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়। তাঁর মনে রাজনীতির একটি নতুন দিক খুলে যায় যখন তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তৎকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন এবং সেগুলো নিয়ে পড়াশোনা করেন। কারণ তাঁর জন্য বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিলো। বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে জানার পর তিনি উপলব্ধি করেন ভারতবর্ষকে যদি একটি আধুনিক সভ্য জাতি হতে হয়, তাহলে ভারতবাসীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে যেতে হবে, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিভাগযোগ্য নয় আর তার চেয়েও বড় কথা স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সামরিক শক্তি থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এই সময় কলকাতার আবহাওয়া ক্রম অবনতি হচ্ছিলো এবং ব্যাপক হারে ছাত্র গ্রেপ্তার চলছিলো। ১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ওটেনের ঘটনার কারণে সুভাষকেও কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এই সময় তিনি প্রথম নেতৃত্ব গ্রহণের শক্তি লাভ করেছিলেন। ওটেনের ঘটনার ফলে সুভাষের পরিবর্তন এসেছিলো ঝড়ের গতিতে। আর ঠিক এভাবেই তিনি ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন আমাদের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

অদূর ভবিষ্যতে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার কোনো আশা না থাকায় তিনি গভীর আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যুবকদের শারীরিক উন্নতির জন্য যুব সংগঠনের কাজেও তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ধর্মীয় উৎসব এবং পূজা প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান পরিচালনার কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। পরে ১৯১৭ সালে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ জড়িয়ে পড়তে লাগেন, হয়ে ওঠেন আমাদের গর্ব, বাঙালি তথা সারা ভারতবর্ষের গর্ব। আমাদের প্রত্যেকের উচিত তাঁর জীবনী পড়া এবং তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করা। আমরা যদি এইসব মানুষের জীবনী না জানি তাহলে কখনোই বুঝতে পারবো না কিভাবে মহান মানুষেরা নিজেদের রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা অর্জন করেছেন।

তথ্যসূত্র :-
১) আত্মজীবনী - নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
২) অনির্বাণ জ্যোতি - শিশিরকুমার বসু
৩) উইকিপিডিয়া



বেদসংজ্ঞাবিচারসমীক্ষা

শৌনক রায় চৌধুরী

এই প্রবন্ধে দয়ানন্দ সরস্বতী কৃত ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা গ্রন্থের বেদসংজ্ঞাবিচারঃ অধ্যায়ের সমীক্ষা করা হবে। জিজ্ঞাসু পাঠকদের পড়তে ও ভুল হলে তীব্র সমালোচনা করতে আহ্বান জানাই।

দেখুন এই অধ্যায়ের শুরুতেই দয়ানন্দ বললেন, শুধু মন্ত্রসংহিতার নাম বেদ। কিন্তু তিনি তার সপক্ষে কোনো প্রমাণ দেননি। আর তিনি ঋষি না হওয়ায় {দয়ানন্দর ঋষিত্ব খণ্ডন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।} তাঁর প্রমাণহীন কথন গ্রাহ্য নয়।

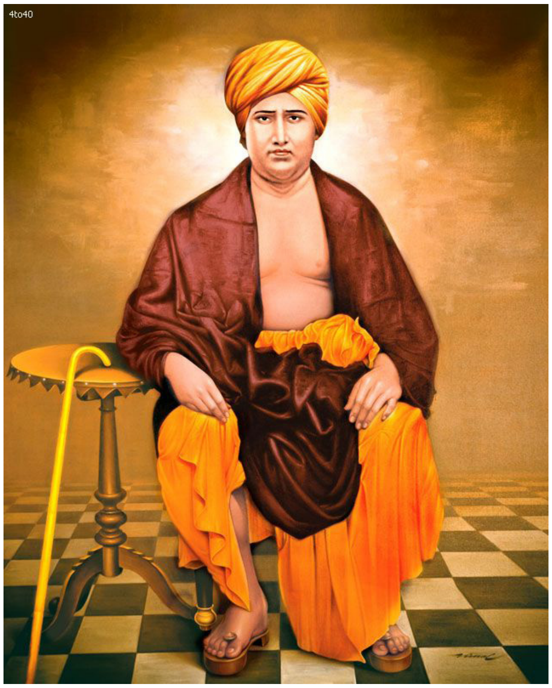
তার পরেই তিনি নিজে এক প্রশ্ন রেখেছেন, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নাম বেদ, এটা কাত্যায়ন ঋষি বলেছেন। তাহলে ব্রাহ্মণভাগ বেদ হবে না কেন? উত্তরে লিখেছেন, ব্রাহ্মণের নাম বেদ হবে না, কারণ ব্রাহ্মণের নাম ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা ও নারাশংসী। আসুন এর একটু সমীক্ষা করা যাক।

এর সপক্ষে দয়ানন্দ অন্যত্র আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন - **ব্রাহ্মণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীরিতিহাসপুরাণানীতি**। আমরা তা দেখে পর্যালোচনা করব।

দয়ানন্দ খণ্ডিত প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন, আমরা সত্য উন্মোচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রমাণ উদ্ধৃত করছি। অথ স্বাধ্যায়মধীয়ীত ঋচো যজূংষি সামান্যথর্বাঙ্গিরসো ব্রাহ্মণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীরিতিহাসপুরাণানীতি (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৩.৩.১)। অদাদিগণীয় আত্মনেপদী ইঙ্ অধ্যয়নে নিত্যম্ অধিপূর্ব ধাতুর বিধিলিঙ্ লকারে প্রথমপুরুষ একবচনের রূপ হয় অধীয়ীত। এর অর্থ তার পড়া উচিত। অর্থাৎ প্রতিদিন **ঋচঃ** (ঋক্ মন্ত্রসমূহ), **সামানি** (সামমন্ত্র সমূহ), **যজূংষি** (যজুঃ মন্ত্রসমূহ), **ব্রাহ্মণানি** (ব্রাহ্মণসমূহ), **কল্পান্** (কল্পসমূহ), গাথা (গাথা), **নারাশংসী** (মানুষের প্রশংসাসূচক মন্ত্র), ইতিহাস ও পুরাণ পড়া উচিত। উদ্ধৃত প্রমাণে কোথাও বলা হয়নি যে ব্রাহ্মণের অপর নাম কল্প, গাথা, নারাশংসী, ইতিহাস ও পুরাণ। বিশেষতঃ কল্প হল বেদাঙ্গ, গাথা ও নারাশংসী মন্ত্রভাগের অংশ। যাস্কাচার্য নারাশংসী মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন এইভাবে, যার মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা করা হয়, তাকে নারাশংস মন্ত্র বলা হয় (নিরুক্ত ৯.৯)। এরপরে তিনি ঋগ্বেদ শাকল সংহিতার (১.১২৬.১) মন্ত্রের উদাহরণ দিয়েছেন। এই মন্ত্র তথা শাকল সংহিতাকে দয়ানন্দ নিজে বেদ রূপে স্বীকার করেছেন। নিজে এর উপরে অনার্ষ ভাষ্যও রচনা করেছেন। তাই যাস্কাচার্য ও দয়ানন্দর সম্মতি অনুসারেই নারাশংস বা নারাশংসী একপ্রকার মন্ত্র, ব্রাহ্মণের অংশ নয়। গাথার বিষয়ে যাস্কাচার্য

লিখেছেন, সেই মন্ত্রে ইতিহাস, ঋক্ ও গাথা মিশ্রিত আছে (নিরুক্ত ৪.৬)। অতএব নারাশংসীর মতনই গাথাও মন্ত্রেরই অংশ। স্থালীপুলাক ন্যায় অনুসারে একাধিক ভুল থাকায় দয়ানন্দর ভুল বলেই বিবেচিত হবে। তিনি নিজেও ভাগবত খণ্ডনম বইতে এই ন্যায়ের ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁর দাবি ব্রাহ্মণভাগ বেদ নয়, তা সত্য নয়। কাত্যায়ন ও অন্য ঋষিমুনিদের প্রমাণ অনুসারে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিলিয়েই বেদ বলে কথিত হয়। যেমন আপস্তম্ব বলেন, **মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নাম বেদ** (আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র, ২৪.১.৩১)।

এবার দুর্জনতোষন্যায় অনুসারে বিচার করা যাক। আপাতত ধরে নিন, দয়ানন্দর বক্তব্য ব্রাহ্মণের অপর নাম হল ইতিহাস, পুরাণ আদি, এটা সঠিক। আপাতত এর পক্ষে কোনো প্রমাণ না থাকলেও এটা সত্য ধরে নেওয়া যাক। আচ্ছা, কারোর নাম ইতিহাস, পুরাণ হলে তার নাম ব্রাহ্মণ হতে পারবে না, এটা কি কোনো ঋষিমুনি বলেছেন? উত্তর হল না, এরকম কেউ বলেননি। বললে দয়ানন্দ বা পরবর্তী সমাজীরা অবশ্যই উদ্ধৃত করতেন। অন্যত্র ইতিহাস রূপে মহাভারত, পুরাণ রূপে ব্রহ্মাদি পুরাণকে মানতে তিনি অস্বীকার করেছেন। তাই ব্রাহ্মণের অপর নাম ইতিহাস, পুরাণ হলেও তার বেদত্বে কোনো বাধা হয় না।



চিত্র - দয়ানন্দ সরস্বতী

কোনো ঋষি বা মুনি বা কোনো ব্রিটিশকালের আগে কোনো ভাষ্যকার বা অনুবাদক বলেননি যে ব্রাহ্মণভাগ বেদ নয়। এরকম হলে দয়ানন্দ বা পরবর্তী সমাজীরা অবশ্যই তা উদ্ধৃত করতেন।

তারপরে দেখুন, দয়ানন্দ বলেছেন, ব্রাহ্মণ মহর্ষিদের করা বেদের ব্যাখ্যান, এটা ঈশ্বরোক্ত নয়, বরং দেহধারী পুরুষদের নির্মাণ। ব্রাহ্মণ বেদের ব্যাখ্যান, এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভট্টভাস্কর লিখেছেন, ব্রাহ্মণ মন্ত্রের ব্যাখ্যান। তাতে করে ব্রাহ্মণের অবেদত্ব সূচিত হয় না, কারণ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সমষ্টি বেদ, তা ভট্টভাস্কর কর্তৃক মান্য।

এরপরে দয়ানন্দ বলছেন, মন্ত্রসংহিতার নাম বেদ এইজন্য যে এটা ঈশ্বররচিত ও সব সত্যবিদ্যার মূল। আবারও দয়ানন্দর ভ্রান্তি স্পষ্ট হল। কারণ বেদ স্বয়ং অপৌরুষেয় (যজুর্বেদ মাধ্যন্দিন বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২.৪.১০), তাই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ কোনোটাই ঈশ্বররচিত নয়। যোগদর্শনে (১.২৪) ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলা হয়েছে, তাই বেদকে অপৌরুষেয় বলার অর্থ এই যে **সাধারণ মানুষ তো ননই, স্বয়ং ঈশ্বরও বেদের রচনাকার নন।**

এরপরে তিনি বলেন, বেদে ইতিহাস নেই, সায়ণাচার্য আদি ভাষ্যকারের টীকায় বর্ণিত ইতিহাস মিথ্যা। এর খণ্ডন নিরুক্ত থেকেই হচ্ছে। নিরুক্তে (৪।৬) বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, সেই ব্রহ্মে (বেদের মন্ত্রে) ইতিহাস, গাথা ও ঋক্ মিশ্রিত আছে। বেদের অপর নাম ব্রহ্ম, তা আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৩.১৫) থেকে পাই। মনুস্মৃতি (১২.৯৬) বলছে, বেদ থেকে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই জানা যায়। ব্রাহ্মণে ইতিহাস আছে, তাই তা বেদ নয়, এই যুক্তিও অসার বলে প্রমাণিত হল।

এখন মন্ত্রসংহিতায় দেহধারী মানুষের উল্লেখ দেখুন। বেদে (ঋগ্বেদ শাকল সংহিতা ৩.৫৩.৭) **বিশ্বামিত্রায়ে** পদ পাওয়া যায়। দয়ানন্দ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমস্ত সংসার যাঁর মিত্র, এরূপ লিখেছেন। সমাজী সুদর্শনদেব আচার্য কৃত পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী প্রবচন বইতে দেখা যাচ্ছে (**মিত্রে চর্ষৌ**, অষ্টাধ্যায়ী ৬।৩।১৩০) অনুসারে বিশ্বামিত্র শব্দ ঋষিকে বোঝালে বিশ্বমিত্র না হয়ে দীর্ঘ আকার হয়ে বিশ্বামিত্র পদ নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ বিশ্বামিত্র ঋষিকে বোঝায়, সবার মিত্র এই অর্থে বিশ্বমিত্র হয়। তাই বেদে থাকা বিশ্বামিত্র পদ ঋষিকে বোঝায়। দয়ানন্দ এখানেও বেদমন্ত্রের অনর্থ করেছেন।

তারপরে তিনি লিখছেন, ব্রহ্মবৈবর্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত এগুলোতে পরস্পর বিরোধ ও অসম্ভব মিথ্যা কথা লোকেরা লিখে রেখেছে, তাই এসবকে ইতিহাস ও পুরাণ নামে গ্রহণ করা কোনো মানুষের উচিত নয়। আবার পণ্ডিত হলধর ওঝা শাস্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি মহাভারতকে মানেন, এমনটাই বলেন (মূর্তিপূজা শীর্ষক শাস্ত্রার্থ, নং ১০, দয়ানন্দ শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ)। এখানে তিনি কোনো পুরাণকে মানতে অস্বীকার করলেও ভাগবত খণ্ডনম বইতে



চিত্র - আচার্য্য সায়ণ

দেবীভাগবত ও হরিবংশপুরাণের প্রামাণিকতা স্বীকার করেছেন। এখান থেকে দয়ানন্দর বক্তব্যে স্ববিরোধিতা ও সেই কারণে অপ্রামাণিকতা স্পষ্ট। পরস্পর আপাতবিরোধ বেদেও আছে, সেজন্য শ্রুতি অর্থাৎ বেদের দুই স্থানে দুই রকম কথা থাকলে উভয়ই প্রমাণ, তা বলা আছে (মনুস্মৃতি ২.১৪)। আপাতবিরোধ থাকলে যদি শাস্ত্র পরিত্যাজ্য হয়, তাহলে দয়ানন্দর কুযুক্তি অনুসারে বেদও পরিত্যাজ্য হয়ে যায়। কিন্তু এই আপাতবিরোধ অজ্ঞানীকে বিভ্রান্ত করে, প্রকৃত জ্ঞানী বা জিজ্ঞাসুদের নয়। জিজ্ঞাসু সদ্গুরুর অনুসন্ধান করে তাঁর সেবা করে, তাঁকে প্রশ্ন করে বা চরণে প্রণিপাত হয়ে শাস্ত্রের মর্ম জেনে নেন।
এরপরে তিনি ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়নভাষ্য থেকে কিছু উদ্ধৃত করেছেন। সম্যক্ রূপে বাৎস্যায়ন ভাষ্য অবলোকন করলে তিনি জানতেন যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ঋষিদের দ্বারা দৃষ্ট (**পাত্রচয়ান্তানুপপত্তেশ্চ ফলাভাবঃ**, ন্যায়দর্শন ৪.১.৬২ সূত্রের বাৎস্যায়ন ভাষ্য দ্রষ্টব্য), আর মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের দ্রষ্টারাই ইতিহাস ও পুরাণের প্রবক্তা। অর্থাৎ যা ব্রাহ্মণ দৃষ্ট তা অপৌরুষেয় বেদের অংশ আর ব্রাহ্মণ ব্যতীতও পুরাণের অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি বাৎস্যায়নভাষ্য সহ ন্যায়দর্শন পড়তে বলেছেন, তাই সেই গ্রন্থ থেকেই তাঁর মতখণ্ডনের জন্য প্রমাণ উদ্ধৃত করা হল।
এরপরে তিনি বলেন, যাতে দ্রব্যের সামর্থ্য বলা হয়েছে, তাকে কল্প বলে। কিন্তু তার সপক্ষে কোনো প্রমাণ উদ্ধৃত না করায় তা অপ্রামাণিক। বরং দুর্জনতোষন্যায়ে ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা থেকেই তাঁর কথা খণ্ডিত হয়। তিনি লিখেছেন, কল্প হল মানবকল্পসূত্রাদি, আশ্বলায়নাদিকৃত শ্রৌতসূত্রাদি (গ্রন্থপ্রামাণ্যাপ্রামাণ্যবিষয়, ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা)। তিনি নিজে অন্যত্র একরকম কথা বলে এখানে অন্য রকম বলেছেন, তাই তাঁর কথা স্ববিরোধী দোষদুষ্ট।
তিনি এও বলেছেন, যে যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ী প্রমুখদের কথাকে গাথা বলা হয়। কিন্তু না, নিরুক্ত অনুসারে ত্রিত ঋষির কথা (নিরুক্ত ৪.৬) গাথার একটা উদাহরণ।
পতঞ্জলি মুনি মহাভাষ্য পস্পশাহ্নিকে চার বেদের মোট **১১৩১** শাখার কথা বলেছেন। তিনি শাখাকে বেদ থেকে আলাদা এমনও বলেননি। তাই মাত্র চার সংহিতাই বেদ, দয়ানন্দর এই দাবিও ভ্রান্ত।
এরপরে দয়ানন্দ পস্পশাহ্নিকে উদ্ধৃত চার বেদের মন্ত্রকে এখানে উদ্ধৃত করেছেন। মন্ত্রগুলোর মধ্যে প্রথমেই আছে, **শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে**। দয়ানন্দ ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকার সংস্কৃত অংশে এই মন্ত্রগুলোকে চার বেদের প্রথম মন্ত্র বলে স্বীকার করেছেন ("**প্রথমমন্ত্রপ্রতীকানি বৈদিকেষু শব্দেষূদাহৃতানি**")। এবারে সমাজীদের প্রকাশিত অথর্ববেদ সংহিতায় প্রথম মন্ত্র রূপে "**যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি**" পাওয়া যায়। **শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে** এই মন্ত্র অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ সংহিতার প্রথম মন্ত্র, যে সংহিতা দয়ানন্দর সময়ে অনাবিষ্কৃত ছিল। দয়ানন্দ তথা অন্য সমাজীরা অথর্ববেদের ক্ষেত্রে শুধু শৌনক সংহিতাকেই বেদ বলে মানেন, যার প্রথম মন্ত্র হল "**যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি**"। অধুনা সমাজীরা কুতর্ক করতে পারতেন, যে এগুলো প্রথম মন্ত্র নয়। তবে সংস্কৃতে এগুলোকে চার বেদের প্রথম মন্ত্র বলে স্বীকার করে দয়ানন্দ নিজেই সে পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। এরপরে তিনি বলেন, মহাভাষ্যে উল্লেখিত **গৌরশ্বঃ** এই উদাহরণ ব্রাহ্মণের। এখানে পতঞ্জলি মুনি গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষঃ প্রভৃতিকে বেদের থেকে উদ্ধৃত করেননি, শুধু কয়েকটা নাম দিয়েছেন মাত্র। এই নাম তো বেদে ও লৌকিক ভাষায় উভয়ত্র আছে। শুধু এগুলো ব্রাহ্মণে আছে, তাই ব্রাহ্মণ বেদ নয়, এরূপ কুযুক্তির উত্তর দেখুন। অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, **গৌরশ্বঃ পুরুষঃ** এই পদ বেদে (অথর্ববেদ শৌনক সংহিতা ৮.২.২৫) পাওয়া যায়। তাহলে এগুলো ব্রাহ্মণের পদ, তাই ব্রাহ্মণ বেদ নয়, এই কথা নিতান্তই অজ্ঞতা। অনুরূপ যুক্তিতে মন্ত্রসংহিতাও বেদ হবে না, কারণ সেখানেও এই পদ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে যদি ব্রাহ্মণভাগ বেদ-ই হয়, আলাদাভাবে ব্রাহ্মণের থেকে উদাহরণ দেওয়া হল না কেন? দেখুন, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সমষ্টি হল বেদ। বেদপুস্তকে শুরুতে মন্ত্র ও পরে ব্রাহ্মণ থাকে। এই পুরোটার প্রতিনিধি রূপে শুধু প্রথম মন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এতে সম্পূর্ণ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণেরই গ্রহণ হয়। নচেৎ এমনও বলা যায় যে ঋগ্বেদ সংহিতার

দশটা মণ্ডল আছে, বা যজুর্বেদ মাধ্যন্দিন সংহিতার চল্লিশটা অধ্যায় আছে, প্রতিটা মণ্ডল বা অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত করা হয়নি, অতএব ওগুলো বেদ নয়।

এই বেদসংজ্ঞাবিচার অধ্যায়ের শুরুতে দয়ানন্দ স্বীকার করেন যে, ঋষি কাত্যায়ন মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বেদসংজ্ঞা মেনেছেন। এবারে তিনি সেবিষয়ে কিছু কুযুক্তি উত্থাপন করেছেন, যার সমীক্ষা এরপরে করা হচ্ছে।

এবারে দয়ানন্দ বললেন যে, ব্রাহ্মণের বেদসংজ্ঞা ঋষি কাত্যায়ন সহচার লক্ষণার জন্য করেছেন, তাই এই সংজ্ঞা গ্রাহ্য নয়। ঋষি কাত্যায়ন নিজে বলেননি যে, তিনি লক্ষণার জন্য এই সংজ্ঞা করেছেন। এটা নিতান্তই দয়ানন্দর মস্তিকপ্রসূত অনার্ষ কল্পনা মাত্র। দয়ানন্দ বলছেন, অমুক লাঠিকে খাইয়ে দাও এর থেকে বুঝতে হবে, লাঠি যার হাতে আছে, সেই মানুষকে খাওয়াতে হবে। দেখুন, এইক্ষেত্রে লাঠিওলা মানুষকে খাওয়াও, এরকমই বলা হয়। লাঠিকে খাওয়াও, এরকম বলা হয় না।

এরপরে দয়ানন্দ বলছেন, অন্য ঋষিরা ব্রাহ্মণের বেদসংজ্ঞা বিষয়ে কিছুই বলেননি, তাই এটা গ্রাহ্য নয়। যদি দুর্জনতোষন্যায়ে ধরে নেওয়া হয় যে অন্য কোনো ঋষি ব্রাহ্মণের বেদসংজ্ঞা মানেননি, সেখানে এটাও স্পষ্ট যে ব্রাহ্মণের বেদসংজ্ঞা নিরাকরণও কোনো ঋষি করেননি। কোনো ঋষি বা মুনি বা সাধারণ ভাষ্যকারও যদি বলতেন যে ব্রাহ্মণভাগ বেদ নয়, তাহলে অবশ্যই তা উদ্ধৃত হত।

শেষে বলছেন, ব্রহ্ম নাম ব্রাহ্মণের। দেখুন, ব্রহ্ম বেদের প্রতিশব্দ, তাই ব্রাহ্মণকেও ব্রহ্ম নাম দিয়ে বলায় কোনোই সমস্যা হয় না। সমাজী আর্যমুনির লেখা গীতাযোগপ্রদীপার্যভাষ্যেও (৩.১৫) একই কথা আছে। আর ব্রাহ্মণ মহর্ষিদের লেখা বেদের ব্যাখ্যান, এরকম মন্তব্য কোনো ঋষি বা ব্রিটিশকালের আগে অন্য কেউই করেননি, তাই এটা নিতান্তই কল্পনা।

তিনি বারবারই কুযুক্তি প্রয়োগ করে নিজ নিরাধার কল্পনাকে সিদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। শাস্ত্রের নিবিড় অবলোকনে দেখা যাচ্ছে, দয়ানন্দর উদ্ধৃত বিভিন্ন প্রমাণ তাঁর সপক্ষে তো নয়ই, বরং বারবার তাঁর বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এটা তাঁর অজ্ঞানতা অথবা ইচ্ছাকৃত অভিসন্ধিকে নির্দেশ করে। দুর্জনতোষন্যায় অনুসারে এখানে সমাজী অনুবাদক বা ভাষ্যকারদের সম্পাদিত সংস্করণই ব্যবহৃত। এর খণ্ডনের জন্য সমাজীদের সাদর আহ্বান জানাই।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) দয়ানন্দ (২০১০), ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা, আর্ষ সাহিত্য প্রচার ট্রাস্ট, দিল্লী
২) রায়চৌধুরী, শৌনক, দয়ানন্দর ঋষিত্ব খণ্ডন
৩) ব্রহ্মমুনি (১৯৬৬), নিরুক্তসম্মর্শ, আর্য সাহিত্য মণ্ডল লি., অজমের
৪) দয়ানন্দ, ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল, হিন্দী ভাষ্য, সার্বদেশিক আর্য প্রতিনিধি সভা, নতুন দিল্লী
৫) দয়ানন্দ, ভাগবত খণ্ডনম্
৬) সুদর্শনদেব (১৯৯৯), পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী-প্রবচনম্, পঞ্চম ভাগ, ব্রহ্মর্ষি স্বামী বিরজানন্দ আর্ষ ধর্মার্থ ন্যাস, গুরুকুল ঝজ্জর, হরিয়ানা
কবিরাজ রঘুনন্দন সিংহ 'নির্মল' সম্পাদিত (২০১০), দয়ানন্দ শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ তথা বিশেষ শঙ্কা-সমাধান, আর্ষ সাহিত্য প্রচার ট্রাস্ট, দিল্লী
আর্যমুনি, গীতাযোগপ্রদীপার্যভাষ্য

বি.দ্র.: এখানে এমএলএ ধরনে গ্রন্থপঞ্জি লেখা হয়েছে। এই লেখার বিরুদ্ধে যাবতীয় আইনি কার্য মহামান্য কলিকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের (Calcutta High Court) অধীনে পড়ছে।



দেবী সরস্বতী কার পত্নী?

সৌরভ দাশ

সনাতন ধর্মের বেদ থেকে পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র থেকে তন্ত্রশাস্ত্র সর্বত্র নানা রূপে যাঁর উপস্থিতি তিনিই জ্ঞান, বিদ্যা ও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। বিভিন্ন পুরাণে দেবী সরস্বতী সম্পর্কে বিভিন্ন উপাখ্যান পাওয়া যায়, যেগুলোর কোথাও সরস্বতী কে ব্রহ্মার পত্নী, কোথায় বিষ্ণুর পত্নী কোথাও আবার শিবের শক্তি বলা হয়েছে। যদিও ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তবু শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করে দেবী সরস্বতী সম্পর্কে যা জানা যায় তারই আলোকে দেবী সরস্বতী সম্পর্কে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করব।
ঋগ্বেদে বলা হচ্ছে –

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।।

(ঋগ্বেদ সংহিতা, শাকল শাখা - ১/১৬৫/৪৫)

অর্থাৎ, বাক চার প্রকার। মেধাবী ঋত্বিকেরা তা জানেন। এর মধ্যে তিনটি বাক হৃদয় গুহায় নিহিত থাকে, প্রকাশিত হয় না। চতুর্থ প্রকার বাক মানুষেরা বলে থাকেন।
বাক চার প্রকার। যথা: পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। চতুর্ধা বাকের ভিন্নতায় চেতনার অবস্থাও চার রকম। যথা: জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়।

১. সর্বপ্রথম যে বাক্ তা হল- পরা। পরা বাকের অবস্থান মানুষের মূলাধারে। ভাষা হল ভাবপ্রকাশের একটা বাহন মাত্র। মানুষ যা কিছু বলেছিল, বলছে বা বলবে, সেই বলার সম্ভাবনা শুধু যে প্রাণশক্তি হিসেবে মানুষের মধ্যে ছিল তাই-ই নয়। বাক্যের যে স্ফূরণ হবে সেই বাক্যটিও বীজ রূপে ব্যষ্টি-মানুষের মধ্যে নিহিত ছিল। সমস্ত অভিব্যক্তির বীজ যেখানে নিহিত রয়েছে, বীজকে ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়নি---সেটাই হচ্ছে ‘পরা’ বাক্ । মানবদেহে মূলাধার চক্রে এর অবস্থিতি। তুরীয় চেতনায় যে বাক্শক্তি তাকেই পরা বাক্ বলে। এই পরা বাক্ হল বাক্শক্তির সর্বোচ্চ অবস্থা, যে অবস্থা থেকে সকল ধ্বনি বা বর্ণ; যা মূলত বাক্যের বীজ স্বরূপ। যার থেকে নিখিল জগতের সকল ধ্বনি,

শব্দ ও বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। পরা বাক্ প্রসঙ্গে 'পূজা প্রদীপ'- এ বলা হচ্ছে:
"প্রণব-রহস্যের' মধ্যে ওঁ কারের 'সপ্তঅঙ্গ':- 'অ', 'উ', 'ম', 'নাদ', 'বিন্দু', 'কলা' ও 'কলাতীত'। সেই সঙ্গে প্রণবের 'চতুষ্পাদ'-'স্থূল', 'সূক্ষ্ম', 'বীজ', ও 'সাক্ষী'।
তাহা হইতেই যোগিগণ স্থূল-শরীরাভিমানী আত্মার ন্যায় মূল-মন্ত্রের যেন স্থূল-নাদাত্মক 'বিশ্ব'রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু সপ্তাঙ্গময়-প্রণবের অবাঙমনসোগোচর অবস্থাই তাঁহার মূল-সপ্তম-অঙ্গস্বরূপ-'কলাতীত' ভাবাত্মক পরমা-নাদ বা পরানাদ-বিকাশের অনাদিভূমি।**"**



২. দ্বিতীয় প্রকার বাক্ হল – পশ্যন্তী। এই পশ্যন্তী বাক্ চেতনার ' সুষুপ্তি 'নামক অবস্থার বাক্‌শক্তি। মূলাধারে যে পরাবাক, যেটি মূলত বাক্যের বীজ, সেই বীজাত্মক শক্তিকে ভাবজগতে যখন কল্পনার ভাব রূপ দেয়া হয় তখনও তা কল্পলোকেই রয়ে যায়। ধ্বনিশক্তির সেই অবস্থাকে বলা হয় 'পশ্যন্তি শক্তি'। পশ্যন্তী বাক্ এবং সুষুপ্তি চেতনা সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ 'আত্মনির্দ্দস্ততয়া নৈরাকুল্যং ভবেৎ সুষুপ্তিরপি।' – আত্মার কোন চেষ্টা নাই, আকুলতা নাই-একেবারে শান্ত। ইহারই নাম সুষুপ্তি। এইরূপে হৃদয় হতে সুষুপ্তি অবস্থায় যে বাক্ তাই 'পশ্যন্তী'। হৃদয়ে এর স্ফূর্তি'। রুদ্র হৃদয়ের অধিপতি। কাজেই পশ্যন্তী বাক্ রুদ্রশক্তি।
পশ্যন্তী বাক সম্পর্কে ' পূজা প্রদীপ' – এ বলা হচ্ছে:
"নাদাত্মক অনাদি 'শ্রুতি' বা তাঁহার 'বীজাত্মক''-'বেদমন্ত্র' দর্শন করিয়াই, 'মন্ত্রদ্রষ্টা' মুনিগণ 'ঋষিত্ব' লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তদাত্মক সেই 'নাদকে' তখন-পশ্যন্তী বলিয়াই জানিবে।**"**
এই পশ্যন্তী বাক্ যেখানে উদ্ভূত হচ্ছে সেই হৃদয়ের অধিপতি হলেন রুদ্র। তাই পশ্যন্তী বাক্ রূপে সরস্বতী হলেন শিবের শক্তি। পশ্যন্তী রূপে সরস্বতী হন শিবপত্নী। মতঙ্গ ভৈরব রূপ শিবের শক্তি শিবানী মাতঙ্গী।

৩. তৃতীয় প্রকার বাক্ হল – মধ্যমা। এই মধ্যমা বাক্ হল 'স্বপ্ন' নামক চেতনার অধিষ্ঠাত্রী বাক্‌শক্তি। চেতনার এই অবস্থা সম্পর্কে বলা হচ্ছে:



"সংজ্ঞারহিতৈরপি তৈরস্যানুভবো ভবেৎ পুনঃ স্বপ্নঃ"

স্বপ্নাবস্থায় অনুভব ইন্দ্রিয় সাহায্যেই হয়, কিন্তু তখন সংজ্ঞা থাকে না। স্বপ্নাবস্থায় যে বাক্ তাহা মধ্যমা। প্রাণ হতে ইহার উৎপত্তি। প্রাণের অধিপতি বিষ্ণু সুতরাং এই হিসাবে মধ্যমা বাক্ বিষ্ণুশক্তি।
মধ্যমা বাক্ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:
"যখন সেই পশ্যন্তী নাদ আজ্ঞাচক্র অতিক্রম করিয়া, অজ্ঞান-ভূমিতে বা মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া-ক্রমে উক্ত সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট ওঁ কারময় নাদের মধ্যস্থানে বা মধ্যমা-নাদরূপ কেন্দ্রে, অর্থাৎ অনাহত-চক্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন যোগীগণ নাদের সেই সূক্ষ্ম বিকাশরূপ অতীব সূক্ষ্ম ধ্বনিময় মেঘ-গর্জনের ন্যায় অদ্ভুত গম্ভীর 'অনাহত-ধ্বনি' হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তখন প্রাণ-হৃদয় মধ্যেও বা অনাহতচক্রে সেই নাদ-ধ্বনি অবিরত ভাবে বিঘোষিত হইতেছে, জানিতে পারেন। তখন নাদের সেই অবস্থা পরিচায়ক ভাবকেই মধ্যমা বলিয়া জানিবে।**"**
অনাহত চক্রের অবস্থান বক্ষস্থলে। প্রাণের অধিপতি হলেন বিষ্ণু। তাই অনাহত চক্রে উদ্ভূত মধ্যমা বাক্ রূপে সরস্বতী হলেন বিষ্ণুর শক্তি। বিষ্ণুপত্নী বাগ্বাদিনী তথা বৈষ্ণবী বিদ্যালক্ষ্মী।

৪. চতুর্থ প্রকার বাক্ হল – বৈখরী। এই বৈখরী বাক্ হল 'জাগ্রত' নামক চেতন অবস্থার বাক্‌শক্তি। যে অবস্থায় আত্মার ইন্দ্রিয়-সাহায্যে উপভোগ হয়, তাহাই জাগ্রৎ -



'স্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্যতাত্মা ভুঙক্তে ভোগান্ স জাগরো ভবতি'

জাগ্রৎ অবস্থায় যে বাক্ তাহার নাম বৈখরী। এই বাক্ আমরা বলে থাকি। বক্ত্রেই এর আবির্ভাব এবং বক্ত্রেই এই বাকের স্ফূর্তি'। বক্ত্রের অধিপতি ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই বেদকর্তা। ব্রহ্মার মধ্যে মুখের বাণীই বেদবাক্য রূপে নিখিল জগতে প্রকাশিত হয়। বাক্শক্তির এই প্রকাশিত, সুব্যক্ত রূপই হল বৈখরী। মুখেই এঁর প্রকাশ। আর মুখের অধিপতি ব্রহ্মা বিধায় বৈখরী বাক্যের অধিপতিও ব্রহ্মা সুতরাং বৈখরী বাক্ই যখন ব্রহ্মার শক্তি, তখন বৈখরী বাক্ রূপেই দেবী সরস্বতী হন ব্রহ্মাপত্নী, ব্রহ্মাণী শারদা। বৈখরী বাক্ সম্পর্কে বলা হচ্ছে:

"সেই নাদ স্থূল-প্রাণবায়ু-সহযোগে যখন বিশেষভাবে 'খর' বা 'প্রখর' অর্থাৎ সুস্পষ্টরূপে 'স্বর' আখ্যাযুক্ত জীবের কণ্ঠের মধ্য দিয়া তালু আদি বাক্-যন্ত্র-যোগে বাহিরে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা-বৈখরী নামে অভিহিতা হইয়া থাকে।

সেই 'স্বর' বা 'বৈখরী'-নাদই ক্রমে অ-কার হইতে ক্ষ-কার পর্যন্ত পঞ্চাশটী মাতৃকা-বর্ণাত্মক 'অক্ষর' বলিয়া বর্ণিত হয়। সেই অক্ষরসমূহের সংযোগবশে-'পদের', এবং পদের সমন্বয়যোগে জীবের কণ্ঠে- 'বাক্যরূপে' তাহা বিকাশ পাইয়া থাকে। সকল মন্ত্রই সেই বাক্যাত্মক। বেদশাস্ত্র, পুরাণ ও কাব্য-সমূহ এবং যাবতীয় লৌকিকী ভাষা, ষড়্জাদি সপ্তস্বরাত্মক সঙ্গীত ও সমুদায় গাথা, সেই 'বৈখরী'-'নাদ' হইতেই সম্ভূত।**"**

আদিগুরু শঙ্করাচার্য কাশ্মীরে থাকাকালীন 'দেবী শারদা'র ঠিক এরকমই বর্ণনা প্রপঞ্চসার তন্ত্রে বলেছিলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ পদ্মপাদাচার্য তার লিখিত রূপ দিয়েছিলেন।

'অকচটপযাদ্যৈঃ সপ্তভির্বর্গৈর্বিরচিতমুখবাহুপাদমধ্যাখ্যহৃৎকা'

অর্থাৎ, অকচটতপয আদি সপ্ত বর্ণসমষ্টি যাঁর মুখ বাহুদ্বয়, পদদ্বয় এবং হৃদয়বিশিষ্টাবয়বা।

অ, ক ,চ, ট, ত, প, য এই সাতটি মূল বর্ণ/অক্ষর আদতে সমস্ত মাতৃকাবর্ণকে সাতটি বর্গতে ভাগ করে। সেখান থেকে প্রত্যেক বর্গের আদ্যক্ষর নিয়ে অকচটতপয বর্গের সৃষ্টি করে। দেবী স্বয়ং শব্দব্রহ্মময়ী। যাঁর থেকে সমস্ত সৃষ্টি রচিত হয়েছে। শব্দব্রহ্মময়ী আদি জননীর থেকেই বর্ণ বাক বিন্দু কলা ও প্রণবের উৎপত্তি হয়। প্রণব (ওঁ) যা সম্পূর্ণ মহাজগতের সৃষ্টি স্থিতি ও ব্যাপ্তির কারণ। এই অ কারাদি ক্ষ কারান্ত বর্ণমালা সমূহই শব্দব্রহ্মময়ী দেবীর লিপিময় তনু। এর প্রমাণও আমরা পাই পূজার সময় মাতৃকান্যাসের মন্ত্রে। বর্ণ সমূহকেই সংস্কৃতে বলে মাতৃকা। মাতৃকান্যাসের ঋষি হলেন ব্রহ্মা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন সরস্বতী, যেখানে ব্যঞ্জনবর্ণকে স্বরবর্ণ দ্বারা পুটিত করে করন্যাস এবং অঙ্গন্যাসের মাধ্যমে সাধক বা পূজকের পাঞ্চভৌতিক শরীরেও আদিমাতৃকা বর্ণ সমূহের বিন্যাসের মাধ্যমে পূজক নিজেও লিপিময় হয়ে ওঠেন।

বৈখরী বাক্ হল যেখানে ভাবের ভাষায় রূপান্তর হয়ে যাচ্ছে। আর শেষে হচ্ছে শ্রুতিগোচরা। এখন জিহ্বা, আলজিহ্বা ও দাঁতের সাহায্য নিয়ে সেই বৈখরী শক্তি বাইরে ভাষারূপে ব্যক্ত হয়ে যাচ্ছে। মূলাধারবাসিনী কুলকুণ্ডলিনীর অনুচ্চার্যা স্ফোট অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে বাকযন্ত্রাদির সহযোগে উচ্চারিত হচ্ছেন। যেন অপ্রকাশিত অবস্থা থেকে প্রকাশিত হচ্ছেন। তূরীয় চেতনায় যে পরা নামক বাক্ অব্যক্ত, অস্ফুট, বীজাকারে ছিল তাই ক্রমান্বয়ে সুষুপ্তি চেতনায় পশ্যন্তী (শিবের শক্তি) > স্বপ্ন চেতনায় মধ্যমা (বিষ্ণুর পত্নী) > জাগ্রত চেতনায় বৈখরী (ব্রহ্মার পত্নী) রূপে ব্যক্ত, স্পষ্ট, শ্রুতির যোগ্য, বোধগম্য বাক্য রূপে মুখ থেকে নির্গত হল। বাক্যের এই চার প্রকারভেদ এবং চেতনার এই চার অবস্থা তথা বাক্যের উৎপত্তিস্থলের অধিপতি দেবতার শক্তি হিসেবে বাক্শক্তি রূপিণী সরস্বতী কখনও বিষ্ণুপত্নী হচ্ছেন, কখনো ব্রহ্মার পত্নী হচ্ছেন, কখনো শিবের শক্তি হচ্ছেন।

যেভাবে একই দেবী গঙ্গা বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুপত্নী, কৈলাসে শিবপত্নী আবার মর্ত্যে রাজা শান্তনুর পত্নী; ঠিক সেভাবেই একই বাক্ রূপিণী দেবী সরস্বতী বৈখরী বাক রূপে ব্রহ্মার পত্নী, মধ্যমা বাক্ রূপে বিষ্ণুর পত্নী, পশ্যন্তী বাক্ রূপে শিবের শক্তি এবং পরা বাক্ রূপে নির্গুণা সর্ববর্ণাত্মিকা মহাশক্তি রূপিণী। বেদের এই চার প্রকার বাক্ তত্ত্বই পুরাণে সরস্বতীর বিভিন্ন দেবতার পত্নী রূপে উল্লেখিত হওয়ার কারণ।

পরিশেষে দেবীর কাছে এই প্রার্থনা:

যয়া বিনা জগৎসর্বং শশ্বজ্জীবন্মৃতং ভবেৎ।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ॥

যাঁর কৃপাদৃষ্টি ক্ষণার্ধকাল তিরোহিত হলে জগৎ সর্বস্ব জীবন্মৃত হয়ে যাবে, জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী সেই আদিজননী দেবী সরস্বতী কে প্রণাম জানাই।

শ্রীশ্রী সরস্বত্যার্পণমস্তু......

তথ্য ঋণ:

১) ঋগ্বেদ সংহিতা
২) প্রপঞ্চসার তন্ত্র
৩) সরস্বতী – অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।
৪) পূজা প্রদীপ – শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী।



হরিহর তত্ত্ব

পৃথা সান্যাল

ভারতীয় ঐতিহ্যে দেবমূর্তির যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য দেখা যায়, তার মধ্যে "হরিহর" রূপ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই রূপ কোনো একক দেবতার পরিচয় নয়; বরং একই সঙ্গে বিষ্ণু ও শিব এই দুই দেবতার ঐক্যকে প্রকাশ করে। 'শঙ্কর' অর্থে শিব এবং 'নারায়ণ' অর্থে বিষ্ণু এই দুই নামের সমন্বয়ে হরিহর রূপটি 'শঙ্করনারায়ণ' নামেও পরিচিত। বৈষ্ণব ও শৈব উভয় ধারার ভক্তরাই এই রূপকে পরমেশ্বরের এক বিশেষ প্রকাশ হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করে থাকেন।

হিন্দু দর্শনের আলোকে 'হরিহর' কথাটি একই পরমেশ্বরের দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সহাবস্থান বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। তবে ধর্মীয় চিন্তার বিবর্তন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিকাশের ফলে শিব ও বিষ্ণুকে ঘিরে নানা দার্শনিক অবস্থান গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণব মত অনুসারে বিষ্ণুই সর্বোচ্চ ঈশ্বর, আর শৈব দর্শনে শিবকে পরমেশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবার বহু দার্শনিক ধারায়, এই দুই দেবতাকে একই ঈশ্বরের ভিন্ন প্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে কিছু উপনিষদীয় ও তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যায় শিব ও বিষ্ণুকে নিরাকার ব্রহ্মের দুই সাকার রূপ বলেও গণ্য করা হয়। শিবানন্দের মতে: "শিব ও বিষ্ণু এক ও অভিন্ন। তাঁরা স্বরূপত এক ও অভিন্ন। সর্বব্যাপী পরমাত্মা বা পরম সত্যের বিভিন্ন রূপের এই দুটি ভিন্ন নাম। স্বামীনারায়ণের দর্শনেও শিব ও বিষ্ণুকে একই ঈশ্বরের ভিন্ন রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়।"

হরিহর রূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একই দেহের সমবিভাজন। বিগ্রহের অবয়বকে লম্বালম্বিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করে দুই দেবতার স্বাতন্ত্র্যসূচক লক্ষণ প্রকাশ করা হয়। এই রূপে দক্ষিণাংশে অর্থাৎ ডানদিকে শিবের অবয়ব এবং উত্তরাংশে অর্থাৎ বামদিকে বিষ্ণুর অবয়ব দেখা যায়। শিবের অংশটি সাধারণত সাদা বা ধূসর বর্ণের হয়ে

থাকে। তাঁর জটাজুটধারী মস্তকে অর্ধচন্দ্র বিরাজ করে এবং কখনও দেবী গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করতে দেখা যায়। গলায় থাকে নাগরাজ বাসুকি এবং হাতে থাকে ডমরু ও ত্রিশূল। বিষ্ণুর অংশটি নীল বা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে থাকে। তাঁর মস্তকে রাজকীয় কিরীট এবং দেহে নানা অলঙ্কার শোভা পায়। হাতে শঙ্খ, চক্র বা গদা ধারণ করেন। অনেক সময় বাহনরূপে বিষ্ণুর পদতলে গরুড় এবং শিবের পদতলে নন্দী মহারাজকে একসঙ্গে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।
এই রূপের নেপথ্যে রয়েছে নানা শাস্ত্রীয় ভিত্তি। বিভিন্ন পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থে শিব ও বিষ্ণুর এই অভিন্নতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় স্কন্দ উপনিষদে হরিহর রূপ সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে।
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ।।

অর্থাৎ শিবের হৃদয়ে বিষ্ণু বাস করেন এবং বিষ্ণুর হৃদয়ে শিব অবস্থান করেন। এ থেকে বোঝা যায়, শিব ও বিষ্ণু স্বরূপত অভিন্ন, শুধুমাত্র ভিন্ন নাম ও আকারে প্রদর্শিত হন।
লিঙ্গপুরাণে দেখা যায়, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদ মিটিয়ে যখন পরমেশ্বরের আবির্ভাব ঘটে, তখন বিষ্ণু মহাদেবকে 'অর্ধমাত্রা', 'ওঙ্কার' ও 'পরমাত্মা' হিসেবে সম্বোধন করেন। মহাদেবও উত্তর দেন যে, একই পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা, সংরক্ষণের জন্য বিষ্ণু এবং সংহারের জন্য শিব এই তিন রূপ ধারণ করেন।
অগ্নিপুরাণে বর্ণিত আছে, একবার কৃষ্ণের তৎপ্রার্থনা অনুসারে দেবাদিদেব শঙ্কর (শিব) এবং বিষ্ণুর মিলনের একটি দৃশ্য ঘটেছিল। তখন বাণ নামের এক ব্যক্তি দেবতার প্রতি গভীর ভক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণ বাণকে অভয় দান করেছিলেন। সেই সময়ে শঙ্করও বাণকে আশ্বস্ত করলেন, এবং বললেন যে, "আমাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। যে ব্যক্তি আমাদের দুজনকে ভিন্ন বলে মনে করবে, সে সর্বশেষে নিরয়গামী হবে।"
এই আখ্যানটি হর ও হরির অভিন্নতার ধারণাকেই তুলে ধরে। যে ব্যক্তি তাদের মিলিত রূপকে উপলব্ধি করে, সে জগৎ ও নিজের অন্তরের সকল দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি লাভ করে।
হরিবংশপুরাণে বর্ণিত আছে, একবার সমগ্র জগৎ অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল। ত্রিনয়নী শিব ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং তার চারপাশের তীরগুলো দ্বিগুণ দীপ্তিতে প্রস্তুত হল। তখন রুদ্র ও তার সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ (হরি) সবকিছু জানতেন। তিনি বুঝলেন, যদি শিব তার তীর ছুড়ে দেন, সমগ্র সৃষ্টি বিপন্ন হবে। তাই হরি নিজস্ব শক্তি দ্বারা শিবকে স্তম্ভিত করে শান্ত করলেন।
এই দৃশ্য দেখে সমগ্র জগৎ ভয় পেয়েছিল। রুদ্রের কর্মে অপ্রশমিত আগুন, অস্ত্র এবং শক্তি সমস্ত দিককে ঝলসে দিচ্ছিল। তখন কৃষ্ণ নিজেকে ও শিবকে একত্রিত করলেন। তারা একে অপরকে আবরণ করে শান্ত হলেন। এই মিলনের ফলে সৃষ্টি ও ধ্বংসের ভারমুক্তি ঘটলো।
এরপর ব্রহ্মা, নারদ ও মার্কণ্ডেয়কে বলেন,
"রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম হর ও হরি একে অপরের রূপ ধারণ করেছেন। হর হরির রূপে, হরি হরের রূপে। শিব বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন এবং বিষ্ণু শিবের সঙ্গে অভিন্ন। তারা চিরন্তন, শুভ এবং অবিনশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র— তিনজনই এক। যেমন জল এক হয়ে মিশে যায়, তেমনি শিব ও বিষ্ণু এক হয়ে থাকেন; যেমন আগুন আগুনের সঙ্গে এক হয়, তেমনি রুদ্র ও হরি এক।"
ব্রহ্মা আরও বলেন, হর ও হরি এককায়, পূর্ণ এবং সমবিভক্ত। তাদের মিলনের মাধ্যমে পৃথিবী ভারমুক্তি লাভ করে।
ঐতিহাসিকভাবে, হরিহর রূপের উদ্ভব কেবল ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে নয়, বরং সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রতিফলন হিসেবেও দেখা হয়। গুপ্ত যুগ এবং পরবর্তী চালুক্য ও পল্লব শাসনের সময় এই মূর্তির ব্যাপক প্রসার ঘটে। সেই সময় শৈব ও বৈষ্ণব—এই দুই প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যে দ্বন্দ্ব ছিল, হরিহর রূপটি সেই বিবাদ মিটিয়ে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুযায়ী, হরিহর মূর্তির সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় গুপ্ত যুগে। মধ্যপ্রদেশের বিদিশার উদয়গিরি গুহায় (৫ম শতাব্দী) খোদাই করা হরিহর মূর্তি এই সমন্বয়ী ভাবনার প্রথম দিকের সাক্ষ্য দেয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে এই মূর্তিশিল্প অনন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। কর্ণাটকের বাদামী গুহা মন্দির এবং মহাবলীপুরমের শিলালিপিতে হরিহরের যে বিশাল ও সূক্ষ্ম বিগ্রহ পাওয়া যায়, তা প্রাচীন ভারতের শৈল্পিক উৎকর্ষের প্রমাণ। অনেক প্রাচীন তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে রাজারা নিজেদের 'হরিহর-ভক্ত' হিসেবে পরিচয় দিতেন। বিশেষ করে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্কার নামকরণের পেছনেও এই সমন্বয়ী দর্শনের প্রভাব ছিল বলে মনে করা হয়।

উপনিষদীয় উক্তি ও পৌরাণিক আখ্যানগুলির আলোকে স্পষ্ট হয় যে হরিহর রূপে শিব ও বিষ্ণু পৃথক প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, তারা একই পরমেশ্বরের দুই ভিন্ন প্রকাশ। কোথাও তাঁরা পরস্পরের অন্তঃস্থিত রূপে, কোথাও ত্রিমূর্তির সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সংহারকের ভূমিকায় প্রতিভাত হন।

গুপ্ত যুগ থেকে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরশিল্প পর্যন্ত হরিহর মূর্তির বিস্তার দেখায় যে এই ধারণা শুধু ধর্মীয় ভাব নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে হরিহর রূপ ভারতীয় ধর্মচিন্তায় শিব-বিষ্ণুর ঐক্য এবং সৃষ্টির ধারাবাহিকতার এক চিরস্থায়ী প্রকাশ।



তথ্যসূত্র:

১) লিঙ্গ পুরাণ
২) অগ্নি পুরাণ
৩) হরিবংশ পুরাণ
৪) বিভিন্ন ওয়েবসাইট



শিব কি পরমেশ্বর নন?

অদ্বৈতবাদী ছাড়া অন্যান্য বৈষ্ণবগণ শিবকে পরমেশ্বর মানতে চান না। অনেকে বলেন বটে তারা শিবকে ঈশ্বর মানেন কিন্তু তথাপি কিছু ভেদ (যেমন শিব রূপ ধ্বংসাত্মক বলা হয়) থেকেই যায়। আমরা পরমেশ্বর বলতে নির্গুণ ব্রহ্ম ও মায়াযুক্ত হয়ে সগুণ ঈশ্বর উভয়কেই বুঝি। শ্রুতি প্রমাণ দেখুন -

জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
তুষেণ ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবেন তণ্ডুলঃ॥
এবং বদ্ধস্তথা জীবঃ কর্মনাশে সদাশিবঃ।
পাশবদ্ধস্তথা জীবঃ পাশমুক্ত সদাশিবঃ॥

(কৃষ্ণ যজুর্বেদ/স্কন্দ উপনিষদ/৬-৭)

অনুবাদ - জীবই শিব, শিবই জীব, কেবল শিব—শিবময়। কিন্তু এই শিবময়ত্ব তার অপ্রকাশিত, আবরণে আবৃত। চাল ঢাকা আছে তুষের খোলায়। সেই খোলা অপসৃত হলেই প্রকাশ পায় তণ্ডুল। তেমনি কর্মপাশে আবৃত, আবদ্ধ জীব কর্মমোহাচ্ছন্ন। যখনই জীবের কর্মনাশ নয়, তখনই সে হয় পাপমুক্ত। কর্মবন্ধন তাকে আর বন্ধ রাখতে পারে না। কর্মমোহ তাকে আর মোহের ঘূর্ণীপাকে ঘোরাতে পারে না। পাশমুক্ত, মোহমুক্ত সেই জীবই তখন সদাশিব।

এখানে শিব দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝানো হচ্ছে। এছাড়াও বেদে (শ্রুতি) রয়েছে শিবের উদ্দেশ্যে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। 'রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী' নামক বেদ মন্ত্র সম্বলিত শিব স্তুতির জন্য একটি গ্রন্থ রয়েছে। মূলত 'রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী' শুক্লযজুর্বেদ মাধ্যন্দিন বাজসেনীয় শাখার সংহিতা ভাগের মন্ত্র নিয়ে গঠিত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিব স্তুতির জন্য বেদের বিখ্যাত 'পুরুষ সূক্ত' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে আরেকটি বিষয় নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। রুদ্র মানেই শিব মনে করেন অনেকে এবং শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে রুদ্রকে দেবতা বলা হয়েছে বিধায় শিবকে ঈশ্বর মান্য করতে আপত্তি করা হয়। সকল রুদ্রই শিব নন, সকল রুদ্রদেবতাগণের মধ্যে শিব শ্রেষ্ঠ এমন বলা যায়। একইভাবে সকল আদিত্য মানেই বিষ্ণু নয়। 'রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে মূলত শিবের স্তুতিই হয়ে থাকে। দেখে নিন প্রমাণ -

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছাবদামসি।
যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ।।
(রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী - ৫/৪; শুক্ল যজুর্বেদ - মাধ্যন্দিন শাখা - ১৬/৪)

মন্ত্রার্থ- হে গিরিশ মঙ্গল স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা তোমাকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি, যেন আমাদের সকল প্রকার গতিশীল প্রাণীজাত নিরোগ ও সুমনা হয়।

দেখুন মন্ত্রে সরাসরি শিবের নামই এসেছে। বৈষ্ণবীয় পুরাণ শ্রীমদ্বিষ্ণুভাগবতে আছে -

দেবদেব মহাদেব ভূতাত্মন্ ভূতভাবন।
ত্রাহি নঃ শরণাপন্নাংস্ত্রৈলোক্যদহনাদ্ বিষাৎ॥
ত্বমেক সর্বজগত ঈশ্বরো বন্ধমোক্ষয়োঃ
তং ত্বামর্চন্তি কুশলাঃ প্রপন্নার্তিহরং গুরুম্॥

সরলার্থ:- হে দেবতাদের আরাধ্য মহাদেব! আপনি সমস্ত প্রাণীর আত্মা ও জীবনদাতা। আমরা আপনার শরণাগত। ত্রিলোক-ভস্মকারী এই ভয়ঙ্কর তীব্র বিষ থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আপনি সমস্ত জগতের বন্ধন ও মোচনের হেতু (প্রভু), সেইজন্য বিচারশীল ব্যক্তিরা আপনাকে আরাধনা করে থাকেন। কারণ আপনি শরণাগতের ক্লেশহারী ও জগদ্গুরু।

গুণময্যা স্বশক্ত্যস্য সর্গস্থিত্যপ্যয়ান্বিভো।
ধৎসে যদা স্বদৃগ্ ভূমন্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাভিধাম্॥
ত্বং ব্রহ্ম পরমং গুহ্যং সদসদ্ভাবভাবনঃ।
নানাশক্তিভিরাভাতস্ত্বমাত্মা জগদীশ্বরঃ॥

সরলার্থ:- হে প্রভু! আপনার নিজ গুণময়ী শক্তি দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করার জন্যে অনন্ত, সর্বদা একরস থাকা সত্ত্বেও আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নাম ধারণ করেন। আপনি স্বপ্রকাশ। এর কারণ এই যে আপনি পরম গুহ্য ব্রহ্মতত্ত্ব। উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট দেবতা, মানুষ, পশুপক্ষী যত প্রাণী রয়েছে সকলেরই আপনি জীবনদাতা। কারণ আপনি সকলের আত্মা। আপনিই জগদীশ্বর। নানা শক্তি দ্বারা আপনিই জগৎরূপে প্রতীয়মান হন।
(শ্রীমদ্বিষ্ণুভাগবত পুরাণ- ৮/৭/২১-২৪)



এখন অনেক শৈবগণ (অদ্বৈতবাদ মানে না এমন) শিবকে ঈশ্বর মানবেন কিন্তু বিষ্ণুকে খাটো করতে চাইবেন। তাই আপনাদের জন্য শ্রুতি বচন -

শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে।
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুঃ বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ।।
যথা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময় শিবঃ।
যথান্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরাযুষ্যু।।

(কৃষ্ণ যজুর্বেদ, স্কন্দ উপনিষদ, ৮-৯)

অনুবাদ: শিবই বিষ্ণুরূপ, বিষ্ণুই শিবরূপ। শিবের হৃদয় বিষ্ণু, বিষ্ণুর-ও হৃদয় শিব। শিবময় বিষ্ণু, বিষ্ণুময় শিব। এই দুইয়ের মধ্যে আমি কোন অন্তর দেখি না, কোন ভেদ দেখি না। যেমন আমি কোন ভেদ দেখি না আমার জীবন আর মঙ্গলকর্মের মধ্যে।

এই শ্রুতি সকলেরই মানা উচিত, সে হোক বৈষ্ণব কিংবা শৈব। অদ্বৈত দর্শন অনুযায়ী পঞ্চমতের আরাধ্যের একত্বই প্রাধান্য পায়। বর্তমানে সংঘবদ্ধ হিন্দুর বড়ই অভাব, আর এই অভাব শুধুমাত্র অদ্বৈত দর্শন দ্বারাই মেটানো সম্ভব।

মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং
বিভূম বিশ্বনাথং বিভুত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং
সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্।।

অনুবাদ: যিনি মহেশ্বর ও দেবগণের ঈশ্বর, যিনি সুরবৃন্দের অরাতিকুল (শত্রু) নির্মূল করেন, যিনি বিভু, বিশ্বনাথ এবং বিভূতি দ্বারা অঙ্গভূষণ করেন, যিনি, বিরূপাক্ষ, যাঁহার চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি নয়নত্রয় এবং যিনি সদানন্দ, সেই পঞ্চবক্ত্র (পঞ্চমুখ) প্রভুকে স্তব করি।

(আদিগুরু বিরচিত, বেদসার শিবস্তোত্র - ২)

হর হর মহাদেব🙏
সত্যের সন্ধানে সনাতন



আমাদের ধর্মের নাম কী?

শ্রী অপূর্ব মোদক চৌধুরী

আমরা সচরাচরই দেখতে পাই যে কিছু মতাবলম্বীগণ আমাদের সামনে এক উদ্ভট প্রশ্ন উত্থাপন করে আর সেটা হলো তোমাদের ধর্মের নাম কি? বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতের কিছু বিশেষ সম্প্রদায় ও মতাবলম্বীগণ এই ধরনের প্রশ্ন করে আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়। সচরাচর যখন তারা আর কোন প্রশ্ন পায় না বা যুক্তি খুঁজে পায় না যে কি বলে আমাদেরকে তাদের মতাবলম্বী করবে তখন এই ধরনের অযৌক্তিক প্রশ্ন হরহামেশা করে থাকে। তাই আমি আমার প্রবন্ধের মাধ্যমে এই বিষয়ে বহু প্রমাণ বিশ্লেষণ করে আমাদের ধর্মের নাম জানানোর চেষ্টা করব। যেকোনো বিষয়ে প্রমাণ দিতে হলে আগে জানতে হবে প্রমাণ কত প্রকারের হয়। বস্তুত পক্ষে শাস্ত্রে প্রমাণ সম্পর্কে পাতঞ্জল যোগদর্শনে রয়েছে, "প্রত্যক্ষানুমানাগমোঃ প্রমাণোনি।।" (সমাধিপাদ, ৬) অর্থাৎ প্রমাণ তিনধরণের হয়, প্রত্যক্ষ (যেমন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্য), অনুমান (যুক্তি থেকে প্রাপ্ত) এবং আগম (বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস পুরাণাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্য)। আমি আমার এই প্রবন্ধে উক্ত তিনটি প্রমাণ অর্থাৎ বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বা প্রাচীন শিলালেখের থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য, বহু ধরনের যুক্তি এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের মতকে পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্লেষণ করে আমাদের ধর্মের নাম সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ লিখছি।

"ধর্ম" এই শব্দটি হলো একটি ইন্দো ইউরোপীয় সংস্কৃত ভাষার শব্দ। ধর্ম শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার থেকে চার হাজার বছর প্রাচীনগ্রন্থ ঋগ্বেদে। যেমন ঋগ্বেদ সংহিতার শাকল শাখার প্রথম মণ্ডল ১৬৪ নং সূক্তের ৪৩ নং মন্ত্র। এছাড়াও মহাভারতেও অনেকবার ধর্ম শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন: উদ্যোগপর্ব ৩৪/৬৩, উদ্যোগপর্ব ৩৪/৭৪, শান্তিপর্ব ১৩৪/২১৩, স্ত্রীপর্ব ৭/২৩ ইত্যাদি। ধর্ম শব্দটির ব্যবহার প্রাকৃত ভাষায় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোকের বিভিন্ন শিলালেখেও পাওয়া যায়। যেমন: অশোকের দ্বাদশ প্রধান শিলালিপি, অশোকের সপ্তম প্রধান শিলালিপি ও অশোকের পঞ্চম স্তম্ভলিপি। অশোকের 9th major rock Edict এ উল্লেখ পাই যে ধম্মের (সংস্কৃত ধর্ম শব্দ প্রাকৃতে ধম্ম বলে। সংস্কৃতভাষার "ধর্ম" শব্দই খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে শ্রীলঙ্কায় পালি ভাষায় "ধম্মে" পরিবর্তিত হয়েছে) একটি অঙ্গ হলো ব্রাহ্মণ (যারা বেদ ও ব্রহ্মে বিশ্বাসী) ও শ্রমণকে (যারা ভগবান গৌতমবুদ্ধের অনুগামী, বৌদ্ধভিক্ষু) দান করা। এছাড়াও 7th pillar Edict এ ধর্মের বিভিন্ন শাখার

মধ্যে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও জৈন সহ বিভিন্ন শাখার কথা উল্লেখ আছে। "ধর্ম" শব্দের প্রথম দার্শনিক ব্যাখাকার ঋষি কণাদ (যিনি আধুনিক গবেষকদের মতে খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে পঞ্চম শতাব্দীর লোক) ধর্ম সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন যে,

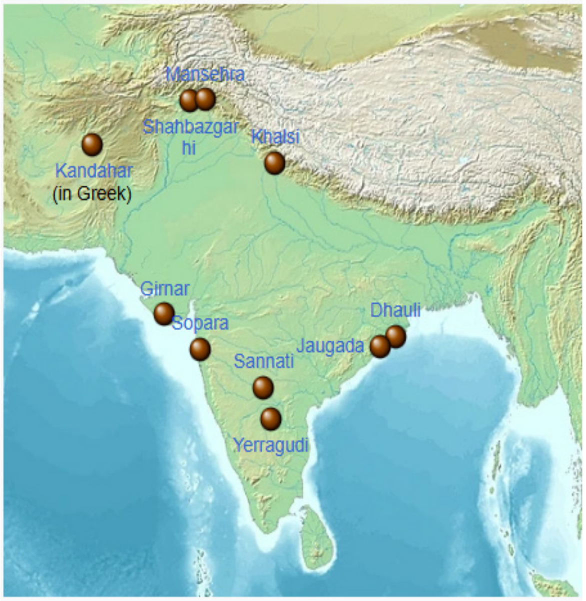
যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ

(বৈশেষিক দর্শন, প্রথমাধ্যায়/প্রথমাহ্নিক/২)

অর্থাৎ, যাহা তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভের হেতু তাহা ধর্ম অথবা যাহা সুখ ও মোক্ষের সাধন তাহাই ধর্ম। ধর্মের গুরুত্ব প্রকাশ করে মহাভারতে উল্লেখ আছে,

★ মহারাজ! এই জগতে মানুষেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে। কিন্তু মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণীতে সেই রূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে না। (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৮৭/২৯)

★ অনুষ্ঠিত ধর্ম্মই ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গলজনক। জ্ঞানীরা যেইরূপ বলেন তাহাতে জানা যায় যে, ধর্ম্ম অপেক্ষা উত্তম বস্তুত আর নাই। (মহাভারত, শান্তিপর্ব,২৮৩/৬)



Location of the Major Rock Edicts.

★ বুদ্ধিমোহযুক্ত যে সকল লোক ধর্ম্মের প্রতি অসূয়া (বিদ্বেষ) করে, তাহারা অপথেই (কুপথেই) গমন করে। সুতরাং তাহাদের অনুগামী লোকও দুঃখবোধ করিয়া থাকে। (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩১২/১১)

★ বৎস! ধর্ম্ম সৎপুরুষের হিত উৎপাদন করে। এই জন্য ধর্ম্মই সজ্জনের আশ্রয় আর স্থাবরজঙ্গমসমন্বিত সমগ্র ত্রিভুবন হইতেই রক্ষা পাইয়া থাকে। (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩০১/৬)

ধর্মের লক্ষণ বা ধর্মের কিছু সাধারণ রীতি রয়েছে যা সকল ধার্মিকদের মধ্যে থাকতে হবে এবং পালন করতে হবে এ সম্পর্কে মহাভারত ও মনুসংহিতাতে পাই যে,

★ ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা, দম (বিষয় সংস্পর্শেও চিত্তের অবিকার), অস্তেয় (পরের ধন অপহরণ না করা), শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, ধী (শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য, ক্রোধের অভাব - এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। (মনুসংহিতা, ৬/৯২)

★ দয়া, হিংসাবর্জ্জন, সাবধানতা, বিভাগ করিয়া পরিজনকে অন্নদান, শ্রাদ্ধ, অতিথি সংস্কার, সত্য, ক্রোধ ত্যাগ, স্বভার্যাসংসর্গে সন্তোষ, পবিত্রতা, পরের দোষাবিষ্কার না করা, ব্রহ্মজ্ঞান ও সহিষ্ণুতা - এই তেরোটি সাধারণ ধর্ম। (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৮৯/২৩-২৪)

★ বেদ, স্মৃতি, সদাচার, নিজের প্রিয় কর্ম - ধর্মের এই চার প্রকার সাক্ষাৎ লক্ষণ। (মনুসংহিতা, ২/১২)

★ সমগ্র বেদ, বেদজ্ঞ ঋষিগণের স্মৃতি ও আচরণ, সজ্জনের আচার এবং নিজের সন্তোষ ধর্মের মূল। (মনুসংহিতা ২/৬)

এখন ধর্মে গৃহীত প্রমাণ গুলো কি কি? প্রমাণ হচ্ছে "প্রমাণৈ অর্থপরীক্ষণম্" (বাচস্পতি) অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা বস্তুর পরীক্ষা। যোগদর্শনের সমাধিপাদের ৭ নং সূত্রের মতে প্রমাণ তিনটি যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। ন্যায় দর্শন মতে প্রমাণ ৪ প্রকার যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এছাড়াও বেদান্ত মতে প্রমাণ ছয়টি ও সাংখ্যকারিকার মতেও প্রমাণ তিনটি। মূলত আমরা যদি প্রমাণ হিসেবে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমকে প্রাধান্য দেই তাহলে ধর্ম বিষয়ে অবিরোধী আগম বা শব্দ প্রমাণই মূল। এই বিষয়ে শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে,

★ তপস্বী, মেধাবী এবং বেদ ও বিজ্ঞানরূপ নয়নসম্পন্ন লোকেরা পরব্রহ্মের বাক্য বেদকে ও ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রকে ধর্ম্মে প্রমাণ বলিয়া মনে করেন। (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৬২/১০)

কিন্তু আমাদের ধর্মের প্রবর্তক কে ? এই সম্পর্কে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে,

★ মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজা বশিষ্ঠ এই সাতজনই "চিত্রশিখন্ডী" নামে বিখ্যাত। ইহারা সাতজনই আদিম ধর্ম্মবক্তা এবং অষ্টম ধর্ম্মবক্তা মনু, ইহারা ধর্ম্ম বলিয়া লোকরক্ষা করিয়াছেন এবং ইহাদের মুখ হইতে ধর্ম্ম নির্গত হইয়াছে। (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩১/৩০-৩১)

অর্থাৎ প্রবক্তা সরাসরি নেই বক্তা রয়েছেন যাঁরা ধর্মাধর্ম নির্ণয় করেছেন।

★ সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সপ্তম সনাতন এই সাতজন ঋষি ব্রহ্মার মানসপুত্র। আপনাআপনিই ইহাদের তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে এবং ইহারা সকলেই নিবৃত্তধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা প্রধান যোগবিৎ, সাংখ্যজ্ঞান বিশারদ, ধর্ম শাস্ত্রের আচার্য্য ও মোক্ষধর্ম্মের প্রবর্তক। (মহাভারত, শান্তিপর্ব,৩২৬/৬৮-৭০)

এখন শাস্ত্রে এই ধর্মের অনেক নাম রয়েছে। যেমন আর্য্য, সনাতন, ভাগবত, হিন্দু ইত্যাদি। এখন এই ধর্মের প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন নামের প্রত্যক্ষ বা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, অনুমান বা যুক্তি এবং আগম বা ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সমূহের দ্বারা প্রমাণ করব।

১) এখন আমাদের এই ধর্মের একটি নাম, **আর্য্য**। ঋগ্বেদ সংহিতা, শাকল শাখায় আর্য শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

★ যিনি অশ্বসমূহকে অধিকার করেছেন, এবং সূর্যকে জয় করেছেন ; ইন্দ্র বহুজনের খাদ্যদায়িণী গাভী অধিকার করেছেন। সুবর্ণের সম্পদ তিনি জয় করেছেন, দস্যুদের বিনাশ করে আর্যবর্ণকে রক্ষা করেছেন। (ঋগ্বেদ সংহিতা, ৩/৩৪/৯)

★ আকাশের শিরোভাগ এবং পৃথিবীর নাভীরূপী অগ্নি অতঃপর ভূলোক ও দ্যুলোকের (অভিভূত) দূত হয়েছিলেন। হে বৈশ্বানর! সকল দেবতা তোমাকে, দেবতাকে আর্যজনের অথবা যজমানের জন্য জ্যোতিঃরুপে উৎপাদন করেছিলেন। (ঋগ্বেদ সংহিতা, ১/৫৯/২)

★ আমি আর্যগণের জন্য পৃথিবী প্রদান করেছি। আমি হবিদাতার জন্য বৃষ্টি প্রদান করেছি। কল্লোলিত জলরাশিকে পরিচালনা করেছি। দেবগণ আমারই ইচ্ছাকে অনুসরণ করে থাকেন। (ঋগ্বেদ সংহিতা, ৪/২৬/২)

সংস্কৃতভাষায় আর্য কথাটি মহৎ চিত্ত ব্যক্তিকে বোঝায়। অর্জুনের কীর্তিনাশক হীন-মন্দভাব দেখে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অনার্যসুলভ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন (দ্রষ্টব্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২/২)। অর্থাৎ যারা হীন বা মন্দভাব রাখেন না এবং সর্বদা কীর্তিমান তারাই আর্য।

২) ধর্মকে শাস্ত্রে, **সনাতন** ধর্ম বলেও উল্লেখ করা রয়েছে। সনাতন শব্দের অর্থ চিরন্তন। ঋগ্বেদেও সনাতন শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় যেমন, ঋগ্বেদ সংহিতার শাকল শাখার ৩/৩/১ এ উল্লেখ হয়েছে "বৈশ্বানরায় পৃথুপাজসে..... সনতা ন দুদুষৎ।।" অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রে বৈশ্বানর অগ্নিদেবকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে তিনি কখনো চিরন্তন (সনতা) যজ্ঞবিধিকে ব্যাহত করেন না। অর্থাৎ যজ্ঞবিধিকে চিরন্তন বা শাশ্বত বলতে 'সনতা' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে ঋগ্বেদে। অথর্ববেদেও সনাতন শব্দের ব্যবহার পাই। অথর্ববেদ সংহিতার শৌনক শাখার ১০/৮/২৩ বা ১০/৪/২/২৩ এ উল্লেখ হয়েছে, "সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য........অন্যস্য রূপয়োঃ।।" এর তুলসীরাম শর্মার অনুবাদ অনুযায়ী ব্রহ্মকে সনাতন বলা হয়েছে আর Ralph T.H. Griffith এর অনুবাদ অনুযায়ী সূর্যকে (শুক্লযজুর্বেদোক্ত ঈশোপনিষদে সূর্যমন্ডলের অভ্যন্তরে ব্রহ্মের স্তুতি রয়েছে) সনাতন বলা হয়েছে। অর্থাৎ বেদ শাস্ত্রে সূর্য তথা ব্রহ্মকে এবং যজ্ঞবিধিকে সনাতন বা চিরন্তন বলে উল্লেখ হয়েছে। মহাভারতেও ভগবান বিষ্ণুকে (শান্তিপর্ব ২০৭/১০) এবং ব্রহ্মাকে (শান্তিপর্ব ২০৫/২১) সনাতন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু "সনাতন" শব্দ আমাদের ধর্মের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুভাগবত, মহাভারত এবং মনুসংহিতার মতো শাস্ত্রে। যেমন:

★সত্য কথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে, অপ্রিয় সত্য বলবে না, মিথ্যা প্রিয় কথাও বলবে না— এই সনাতন ধর্ম। (মনুসংহিতা ৪/১৩৮)

★ বেদাহং জাজলে! ধর্ম্মং সরহস্যং সনাতনং। সর্ব্বভূতহিতং মৈত্রং পুরাণং যং জনা বিদুঃ।।

- জাজলি! লোকে যে ধর্মকে সর্বভূতের হিতসাধক, মিত্রতাজনক ও প্রাচীন বলিয়া জানেন, বেদাদিশাস্ত্রের সহিত সেই সনাতন ধর্ম আমি জানি। (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৫৬/৫)

★ "ত্বত্তঃ সনাতনো ধর্মো রক্ষ্যতে তনুভিস্তব।"- সনাতন ধর্মের উৎপত্তি তোমার (পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি) থেকেই হয়েছে। (শ্রীমদ্বিষ্ণুভাগবত - ৩/১৬/১৮)

★ "ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।।"- আপনিই সনাতন ধর্মের শাশ্বত রক্ষক। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১/১৮)

অর্থাৎ আমাদের ধর্মকে যে সনাতন বলা হয় তাও শাস্ত্রে রয়েছে। আরো মজার ব্যাপার হলো যে সনাতন ধর্ম শব্দ শুধু শাস্ত্রে নয় ষষ্ঠ শতকে প্রাপ্ত প্রাচীন প্লেটেও পাওয়া যায়; যা একটি অন্যতম পুরাতাত্ত্বিক প্রত্যক্ষ নিদর্শন বা প্রমাণ। যেমন: ১৯২৭ সালে বোম্বাই এর Khanapur এ ব্যবহার করা হয়েছে এমন তিনটি প্লেট পাওয়া যায় যা

মহারাজা Mādhavavarman এর সময়কালের (যিনি ৫১০-৫৬০ খ্রিষ্টাব্দের লোক ছিলেন)। উক্ত প্লেটের ভাষা ছিল সংস্কৃতে। উক্ত তিনটি প্লেটের মধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের কথা উল্লেখ আছে। সেখানে এও উল্লেখ রয়েছে যে উক্ত দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন যার নাম Bōlasvāmin of the sālankāyana gotra তাঁর সমন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি আনন্দের সহিত বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র পরায়ণ ও সনাতন ধর্মের অনুসারী। প্রায় ১৫০০ বছর প্রাচীন প্লেটে প্রথম সনাতনধর্ম শব্দটার ব্যবহার দেখা যায় এবং উক্ত প্লেটে বর্ণিত বর্ণনা পড়লেও সুস্পষ্ট হয় যে সনাতন ধর্মাবলম্বী তাঁরা যারা বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ ধর্মকে সনাতন হিসেবে পরিচিতি ১৫০০ বছর আগেও প্রসিদ্ধ ছিল।

৩) আমাদের ধর্মের আরেক নাম **ভাগবত ধর্ম**। ভাগবত শব্দ ভগবৎ বা ভগবান শব্দ থেকে আগত। "ভগবান" শব্দ ঋগ্বেদে উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন ঋগ্বেদ সংহিতার শাকল শাখার ৭/৪১/৪ মন্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে "ভগবন্তঃ"। ঋগ্বেদে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে পরমেশ্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর উপাসনা করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: ৩/৫৫/৪, ৭/৬/৫, ১/১৫৬/২, ১/২২/১৮-২১,১/১৫৫/৬ ইত্যাদি। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (এছাড়াও মহানারায়ণ উপনিষদে) নারায়ণসূক্তে বিষ্ণু, নারায়ণ ও বাসুদেবকে (শ্রীকৃষ্ণ) অভিন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজস্থানে প্রাপ্ত খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর তাম্রলিপি Hathibada Ghosundi Inscriptions এ সঙ্কর্ষণ (বলরাম) - বাসুদেবকে (শ্রীকৃষ্ণ) ভগবান সর্বেশ্বর বলে উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাঁর উদ্দেশ্যে নির্মিত মন্দিরকে নারায়ণমিতি বলা হয়েছে এবং মধ্যপ্রদেশ বেসনগরে প্রাপ্ত খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শিলালিপি Heliodorus pillar এর গায়ে খোদিত শিলালেখে ভগবান বাসুদেবকে দেবদেব বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং গ্রিক রাষ্ট্রদূত হেলিওডোরাসের



নির্মিত বাসুদেবের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্তম্ভকে গরুড়ধ্বজ বলা হয়েছে। উক্ত দুটি প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রলিপি এই বিষয় প্রমাণ করে যে খ্রিষ্টপূর্ব সময় থেকেই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণু স্বরূপে উপাসনা করা হতো। কারণ উক্ত দুটি শিলালিপি ও তাম্রলিপিতে বাসুদেবের মন্দিরকে নারায়ণমিতি বলা ও স্তম্ভকে গরুড়ধ্বজ বলা এই বিষয়ে ইঙ্গিত করে যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সেই সময় থেকেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর থেকে অভিন্নতত্ত্ব হিসেবে ভাবা হতো। বস্তুত যারা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর উপাসক তাদের কে শাস্ত্রে ভাগবত বলে উল্লেখ করা হয়। যেমন ,"অথ ভাগবতা যূয়ং......কর্হিচিৎ।।" (বিষ্ণুভাগবত, ৪/২৪/৩০) এই শ্লোকে শ্রীবাসুদেবের ভক্তকে ভাগবত বলে উল্লেখ করেছেন ভগবান শ্রীরুদ্র। এছাড়াও বৃহন্নারদীয় পুরাণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভাগবতদের লক্ষণের কথা উল্লেখ আছে। ভাগবতধর্মের কথা মহাভারতের শান্তিপর্বের নারায়ণীয়পর্বাধ্যায়েও পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর Hathibada Ghosundi Inscriptions থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণবংশীয় রাজা সর্বতাত (Sarvatāta) নিজেকে একজন ভাগবত (devotion of Vishnu) বলে উল্লেখ করেছেন এবং সর্বেশ্বর সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবের উদ্দেশ্যে একটি মন্দির নির্মাণের কথা উল্লেখ আছে। উক্ত সংস্কৃত ভাষায় ও ব্রাহ্মীলিপির তাম্রলিপিতে পরমভাগবত রাজা সর্বতাতকর্তৃক অশ্বমেধযজ্ঞ করার কথাও উল্লেখ রয়েছে। যা একটি বৈদিক যজ্ঞ। উক্ত ব্রাহ্মীপ্রাকৃত শিলালিপিতে মহাভারতের শ্লোকও বর্ণিত হয়েছে। উক্ত শিলালিপি থেকে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট হয় যে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই ভাগবতধর্ম বৌদ্ধধর্মের ন্যায় বৈদেশিক ব্যক্তিদের মধ্যে পালন করা হতো। এছাড়াও একজন সিরিয়ান লোকের বর্ণনা থেকে এও জানা যায় যে ভাগবতধর্মের কৃষ্ণোপাসনা ভারত থেকে সুদূর আর্মেনিয়ায় খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই প্রচলিত ছিল। ভগবান শ্রীরুদ্রের ঈশ্বরত্ব ও তাঁর উপাসনার কথাও ঋগ্বেদের বহু স্থানে রয়েছে। যেমন: ঋগ্বেদ সংহিতার শাকল শাখার ১/৪৩/১-৬ এবং ১/১১৪/১-১১। সিন্ধুসভ্যতায় খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর প্রাচীন পশুপতি সিল ও খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী উত্তরপ্রদেশে প্রাপ্ত শৈবাগমোক্ত পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছে যা শৈবধর্মের প্রাচীনতা সিদ্ধ করে। শাস্ত্রেও পাশুপত শৈবধর্মের কথা উল্লেখ আছে যেমন

Mathura Pillar Inscription of Chandragupta II: G.E. 61.



মহাভারতের শান্তিপর্বের ২৭৭/১২২-১২৪ এবং শান্তিপর্বের ৩৩৩/৬৩,৬৬ নং শ্লোক উল্লেখযোগ্য। খ্রিষ্টাব্দ ৩৮০ সালের মথুরা থেকে প্রাপ্ত গুপ্ত যুগের শিলালিপি Mathura Pillar inscription of Chandragupta II এ অন্যতম শৈবধারা পাশুপত ধর্মের প্রবর্তক Lakulisha এর শিষ্য Kushika এর কথা উল্লেখ আছে। এই Mathura Pillar inscription of Chandragupta II শিলালিপি পাশুপত শৈবধর্মের অন্যতম প্রাচীন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বা শিলালিপি। মজার বিষয়, উক্ত শিলালিপিতে পাশুপতধর্মের অনুসারী Parashara এবং Kushika এর নামের আগেও ভাগবত কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ শৈবগুরু Parashara আর Kushika কেও ভাগবত (Bhagavata) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন সমস্যা হল এই যে যারা ভগবান বিষ্ণুর উপাসক তাদেরকেই খ্রিষ্টপূর্ব সময় থেকেই ভাগবত বলে উল্লেখ করা হয়ে আসছে যা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু খ্রিষ্টাব্দ তৃতীয় শতকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে শৈবগণও এই ভাগবত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এই বিষয়টা বেশ অদ্ভুত যে শৈবাচার্যগণও ভাগবত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? এই বিষয়ের সমাধান বৃহন্নারদীয় পুরাণে পাওয়া যায়। বৃহন্নারদীয় পুরাণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ পাওয়া যায় যে মার্কণ্ডেয় মুনি যখন ভাগবতের (ভগবদ্ভক্তের) লক্ষণ সম্পর্কে জানতে চান তখন শ্রীভগবান বলছেন,

"শিবে প্রীতি, শিবে ভক্তি, শিবের অর্চনা, রুদ্রাক্ষ ও ত্রিপুন্ড্র ধারণ, হরিনাম ও শিবনাম কীর্তন করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব প্রধান (ভাগবত)। যাহারা দেবাদিদেব শিব ও পরমাত্মা বিষ্ণুকে অভিন্ন ভাবেন এবং শিবধ্যান শিবকার্য্য, পঞ্চাক্ষর মন্ত্রজপ করেন তাঁহারা বৈষ্ণব প্রধান (ভাগবত)। (বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ৬/৫৬-৬১)।"

অর্থাৎ যারা মহেশ্বর শিবের ঈশ্বরত্ব মানেন, শিবারাধনা করেন, পঞ্চাক্ষর আদি শৈবমন্ত্রাদি জপ করেন তাঁরাও ভাগবত হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। এর জন্য সম্ভবত তৃতীয় খ্রিষ্টাব্দের উক্ত শিলালিপিতে পাশুপত শৈব ধর্মাবলম্বীরাও ভাগবত হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

ভাগবত ধর্মের মত শৈবধর্ম বা শিবোপাসক সম্প্রদায়ও তাদের শিবোপাসনা ও শৈবধর্মে বহু বৈদেশিক ব্যক্তিদের ধর্মে প্রভাবিত করার এবং মধ্য এশিয়ায় শৈবধর্ম প্রচারের প্রমাণও আমরা পাই। যেমন, মধ্য এশিয়া থেকে আগত ইন্দো ইউরোপীয় বহিরাগত রাজা Wema Kadphises যিনি কুষাণ যুগের রাজা ছিলেন তাঁর শৈবধর্ম গ্রহণ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। Wema Kadphises কর্তৃক বিভিন্ন মুদ্রায় নন্দীসহিত ত্রিশুলধারী শিবের চিত্রও পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যারা বলে যে সনাতনধর্মের সীমারেখা ভারত পর্যন্তই তাদের এই বিষয়ে ধারণা রাখা উচিত যে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মীয় মতের মাধ্যমে সনাতন ধর্ম তখন বিদেশে প্রচারিত হয়েছে বা বৈদেশিকদের মধ্যে সনাতনধর্ম গ্রহণের প্রমাণ রয়েছে যখন কোনো খ্রিষ্টধর্ম বা ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না, এমনকি ইহুদিরাও এতো বিস্তৃতি লাভ করেনি যেভাবে সনাতন ধর্ম বা বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি হয়েছিল।

৪)আমাদের ধর্মকে আরেক নামেও ডাকা হয় যেটা সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত বটে। যদিও উক্ত নামে বিতর্কের কোন কারণ না থাকলেও বর্তমানে কিছু আব্রাহামিক মতে প্রভাবিত ব্যক্তিরা উক্ত নামকে নিয়ে আমাদেরকে বেশ হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। আর সেই নাম হলো **"হিন্দু"**। কিছু কিছু আব্রাহামিকগণ মনে করে যে "হিন্দু" শব্দটি তাদের দেওয়া। কিন্তু বস্তুত পক্ষে সেটা সঠিক নয়। যদিও "হিন্দু" শব্দটি প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র যেমন ঋগ্বেদাদিতে নেই কিন্তু এই নাম আব্রাহামিকদের দ্বারা দেওয়া হয়নি। বরং হিন্দু নামটি আর্যজাতির আরেকটি পরিচিত ধারাদের দেওয়া এবং তখন দেওয়া যখন যীশু খ্রিস্ট জন্মও গ্রহণ করেননি। "হিন্দু" নামটি দেওয়া আসলে জরথুস্ত্রীয় ধর্মের অনুসারী তথা পারস্যের সম্রাট দারায়ুস প্রথমের যিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৫২২ থেকে ৪৮৬ সালের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রথম

দারায়ুস "হিন্দু" শব্দটা তৎকালীন পারস্যসাম্রাজ্যে তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা সিন্ধু প্রদেশের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। প্রথম দারায়ুসের সময়ে প্রাপ্ত Nakshi-i-Rustam inscriptions (515 BC) এ তাঁর অধীনস্থ সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কিছু অংশকে "হিন্দু" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বস্তুত পক্ষে হিন্দু শব্দ প্রথম জরথুস্ত্রীয় ধর্মের অনুসারী রাজা প্রথম দারায়ুস তাঁর সময়কালীন সিন্ধু অঞ্চলকে বলা হতো। পরবর্তীতে খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচশত বছর পূর্বে সেখান থেকেই সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীও (হয়তো) হিন্দু হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এখন আমরা যদি জরথুস্ত্র মতকে বিশ্লেষণ করি তাহলে এই বিষয়ে সুনিশ্চিত যে ভারতের বৈদিক ও পারস্যের জরথুস্ত্র উভয়ই আর্য্যধর্মের ও আর্যসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও, অনেক গবেষক, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মতে বেদের সিন্ধু শব্দ থেকেই হিন্দু শব্দ এসেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন গর্বের সাথে বলো আমি হিন্দু। পুরী শঙ্কর মঠের বর্তমান শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহাভাগ, প্রবচনে ও প্রকাশিত লিখিত প্রবন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্র ও সংস্কৃত প্রাচীন অভিধান অনুযায়ী দেখিয়েছেন যে - হিন্দু শব্দ বহিরাগতদের থেকে নয় বরং হিমালয় থেকে সিন্ধু নদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারীদেরকেই হিন্দু বলা হয়।

তথ্যসূত্র:

১) বেদগ্রন্থমালা - ঋগ্বেদ সংহিতা - রামকৃষ্ণ মিশন
২) Hymns of Atharva-Veda - Ralph T.H. Griffith
৩) Rigveda - Dr. Tulsi ram
৪) Ancient Indian History and Civilization - Sailendra Nath Sen (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৭ দৃষ্টব্য)
৫) The Iconography of Sadashiva - B N Sharma
৬) Ancient India - R. C. Majumdar
৭) Epigraphia indica volume XXVII এর ৩১২-৩১৮ পৃষ্ঠা
৮) Epigraphia indica volume XXII এর ১৯৪-২০৫ পৃষ্ঠা
৯) Epigraphia indica volume XXI এর পৃষ্ঠা ৩-১৫
১০) THE HELIODORUS PILLAR: A FRESH APPRAISAL - John Irwin
১১) Indian Epigraphy - Richard Salomon এর ২৬৫-২৬৭ পৃষ্ঠা
১২) মহাভারত - হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
১৩) শ্রীমদ্বিষ্ণুভাগবত - গীতাপ্রেস
১৪) শ্রীমদ্বিষ্ণুভাগবত - প্রভুপাদ শ্রীল রাধাবিনোদ গোস্বামী
১৫) ভগবদ্গীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা - স্বামী রঙ্গনাথানন্দ
১৬) The Quest for the Origins of Vedic Culture - EDWIN BRYANT
১৭) মনুসংহিতা - সুরেশচন্দ্র বঙ্গোপাধ্যায়
১৮) Asoka and the decline of the Mauryas - Romila Thapar
১৯) পাতঞ্জল যোগদর্শন - গীতাপ্রেস
২০) Philosophy of Inspiration By Mirgandra Agarwal এর ৪২ পৃষ্ঠা



শূদ্র বিদ্রেষী রাম?

মৃগাঙ্ক রায়

রাম হচ্ছেন এমন একজন যিনি এই উপমহাদেশের ও তার বাহিরেও হিন্দুদের আদর্শ, ঘরে ঘরে পূজনীয়। আবার হিন্দু ছাড়াও দেশে বিদেশে অনেককেই প্রভাবিত করেছেন রাম। রামায়ণ নিয়ে অমলেশ ভট্টাচার্য বলেছেন - "মহাভারত যদি হয় ভারতবর্ষের ধীশক্তি, মেধা, মস্তিষ্ক - তাহলে রামায়ণ তার হৃদয়।"

তাই রাম সম্পর্কে সামান্য কঠোর কিছু আমাদেরকে আঘাত করে। শুধু ভক্তিবাদ যারা অনুসরণ করেন তাদের হিসেবে - রাম শত্রুর প্রতিও ক্রোধ প্রদর্শন করেন না। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ত শুধু ভক্তি মার্গ নয়, ভক্তির পাশাপাশি কর্ম, জ্ঞান ও যোগ মার্গও প্রদর্শন করে থাকে। এমনকি চার মার্গের সমন্বয়ে তৈরি মার্গও নির্দেশিত আছে। রামায়ণেই হিংসার বিষয়ে আছে -

তদলং শোকমালম্ব্য ক্রোধমালম্ব ভূপতে।
নিশ্চেষ্টাঃ ক্ষত্রিয়া মন্দাঃ সর্বে চণ্ডস্য বিভ্যতি।।

(রামায়ণ - ৬/২/২০, সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ)

অনুবাদ: অতএব, ভূপতি, তুমি শোক ত্যাগ করে ক্রোধ আশ্রয় করো। শান্তপ্রকৃতি ক্ষত্রিয়রা অকর্মণ্য হয়, ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকেই সকলে ভয় করে।

অনেকে বিচার বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের অভাবে জবাব দিতে না পেরে উত্তর কাণ্ডকে পুরোপুরি বাতিলই করে দেয়। তবে সেটাও উচিত নয়, অনেক রামায়ণ বিশ্লেষক-অনুবাদকদের মতে উত্তর কাণ্ড ছাড়া রামায়ণ অসম্পূর্ণই থেকে যায়। শিরোনাম অনুযায়ী এবার একটু বিশ্লেষণ করা যাক -

মূল সমস্যাটি হচ্ছে উত্তর কাণ্ডের ৭৩ থেকে ৭৬ নং সর্গে বর্ণিত এক শূদ্রের তপস্যা ও সেকারণে রাম কর্তৃক তার বধ দণ্ড নিয়ে। এতেই আমাদের মত সাধারণ লোকজনের মন বিষাদগ্রস্ত হয়, এত মহৎ একজন আদর্শ, এটা কি করলেন? শুধু মাত্র তপস্যার জন্য একজন শূদ্রকে হত্যা? এমনকি উক্ত অংশে নারদও বলেছেন ঘোর তপস্যা শুধু কলি যুগেই শূদ্রদের জন্য রয়েছে। এটা নিয়েও সমস্যা হতে পারে (এ নিয়ে দ্বন্দ্ব একটু পরই নিরসন হবে)। তাছাড়া

আমরা বর্ণ জন্ম ও কর্ম দুভাবেই মান্য করি (বিস্তারিত বর্ণ নিয়ে এখানে আলোচনা করব না)। যে শূদ্রকে বধ করা হয়েছিল তার নাম হচ্ছে শম্বুক। মূল বিষয়ের বর্ণনা অনুযায়ী এক ব্রাহ্মণের সন্তান অকারণে মারা যাওয়ায় রামের কাছে অভিযোগ করা হয়। রাম কোন অধর্ম করছে বা রামের রাজ্যে কোন অধর্ম হচ্ছে এমন শঙ্কা প্রকাশ করেন ওই ব্রাহ্মণ। তারপর নারদ বললেন এই যুগে (ত্রেতা) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জন্যেই ঘোর তপস্যা বিধেয়, শূদ্র বা বৈশ্য ত্রেতায় ঘোর তপস্যা করবে না। এখানে লক্ষণীয় এই ঘোর তপস্যা মূলত কিরকম সেটা কিন্তু নেই। এমনকি এই তপস্যা যে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে হতে পারে সেটাও নেই। তপস্যা বিষয়টা ভালো, অত্যন্ত প্রশংসনীয় কিন্তু সেটার উদ্দেশ্যের জন্য সেই তপস্যা মলিন হয়ে যায় বা অনুচিত কার্য হয়ে যায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক - কফ বা কাশি হলে যে অ্যালোপ্যাথিক সিরাপ খাওয়া হয় তার মধ্যে কিন্তু এলকোহল আছে। কেউ যদি রোগ সারাতে সেটা পরিমাণমত গ্রহণ করে তাহলে সেটা তার শরীরের জন্য উপকারী। কিন্তু, সে যদি নেশা করার জন্য সেটা গ্রহণ করে তবে না ত সেটা তার শরীরের জন্য ভালো হবে আর না ত সেই কার্যটাকে ভালো বলা যাবে। রাম যখন শম্বুককে হত্যা করে তার পূর্বে শম্বুক কি বলেছিল দেখা যাক -

"অবশেষে দক্ষিণদিকে গিয়ে (রাম) দেখলেন, শৈবল পর্বতের উত্তরে এক বৃহৎ সরোবরের তীরে অধোমুখে লম্বমান হয়ে একজন তপস্বী কঠোর তপস্যা করছেন। রাম তাঁকে বললেন, সুব্রত, তুমি ধন্য। আমি দাশরথি রাম, কৌতূহলবশে প্রশ্ন করছি - কেন এই দুষ্কর তপস্যা করছ? তোমার অভীষ্ট কি স্বর্গলাভ না আর কিছু? তুমি কোন জাতি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূদ্র, সত্য বল।

তপস্বী অধোমস্তকে থেকেই উত্তর দিলেন, আমি সশরীরে দেবত্ব লাভের নিমিত্ত তপস্যা করছি। রাম, আমি দেবলোক জয় করতে চাই। মিথ্যা বলব না, আমি জাতিতে শূদ্র, নাম শম্বুক। রাম তখনই খড়গ কোষমুক্ত করে শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ করলেন।"

'দেবত্ব লাভ করে দেবলোক জয়' - মানে কি? এই বিষয়টা সাধারণভাবে রামায়ণ যারা পড়েন তারা বিচার করেন না। দেবলোকে ত তাঁরাই থাকেন যারা দেবতা। আর দেবতার স্থানগুলোও পদ। তাহলে শম্বুক সেরকম দেবতাই হতে চেয়েছিল যার অধীনে দেবলোক থাকবে। আপনারা সবাই জানেন দেবলোক মূলত স্বর্গই আর স্বর্গ ইন্দ্রের অধীনে থাকে। অর্থাৎ, শম্বুক ইন্দ্র হতেই চেয়েছিল। কিন্তু দেবতা পদে যারা থাকেন তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সেই আসনে থাকেন, এগুলো আপনারা বিভিন্ন পুরাণে পেয়ে যাবেন। একাধিক ইন্দ্র, এমনকি প্রজাপতি ব্রহ্মাও একাধিক এমন পাওয়া যায়। যাই হোক, সেই নির্দিষ্ট সময় শেষ না হলে নতুন কেউ সেই আসনে বসতে পারবে না। কিন্তু শম্বুক ঐ সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই সেটা করতে চেয়েছিল বিধায় নিজের আচার কর্তব্য পূর্বক কর্ম না করে সৃষ্টির নিয়ম ভঙ্গ করতে চেয়েছিল বলা যায়। অমলেশ ভট্টাচার্যের ভাষায় এই তপস্যা ছিল আসুরিক তপস্যা এবং রাবণের তপস্যার সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। যে রাজ্যে এইরকম নিয়ম ভঙ্গ হয় সেই রাজ্যের প্রতি দেবতাগণ তুষ্ট থাকেন না বিধায় রাম বাধ্য হয়েই শূদ্রকে হত্যা করেছেন। বাধ্য হয়ে কর্তব্য পালনের বিষয়ে আদি কাণ্ডে ঋষি বিশ্বামিত্র কৃত রামের প্রতি উপদেশ রয়েছে -

নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা॥

(আদি কাণ্ড - ২৫/১৮)

অনুবাদ: প্রজাগণের রক্ষণের জন্য নৃশংস হউক কিংবা অনৃশংসই হউক, দোষযুক্ত হউক অথবা পাপযুক্তই হউক সকল কর্মই করিতে হয়।

এই এক শ্লোক দিয়ে রামের উপর করা আরো অনেক অভিযোগই খণ্ডিত হয়। নিজ রাজ্যের প্রজার কল্যাণেই রাম শম্বুককে বধ করে নিজের কর্তব্য পালন করেছিলেন। উনি নিম্ন বর্ণের লোকদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব কখনোই রাখতেন না বরং সবাইকে সমান মনে করতেন ও সবার নিজ নিজ কর্তব্য বা স্বধর্ম পালনকেই গুরুত্ব দিতেন। এমনকি উনি প্রাণীদের প্রতিও বিদ্বেষ ভাব রাখতেন না, তাদের সুবিচার দিতেন - উত্তর কাণ্ডে কুকুরের অনুরোধে ব্রাহ্মণের শাস্তির প্রমাণও পাওয়া যায়। যেহেতু সেটাকে প্রক্ষিপ্ত সর্গের অংশ বলা হয় তাই আমরা এবার এই অংশ অরণ্য কাণ্ডের বিষয় দ্বারা বিচার করব।

তৌ দৃষ্টা তু তদা সিদ্ধা সমুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
পাদৌ জগ্রাহ রামস্য লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ॥

(অরণ্যকাণ্ড - ৭৪/৬)

অনুবাদ: তখন তপঃসিদ্ধা শবরী ধীমান রাম ও লক্ষণকে দর্শন করিয়া উত্থান করত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের চরণে প্রণাম করিলেন।

লক্ষ্য করুন - অরণ্য কাণ্ডে শবরীকে তপঃসিদ্ধা বলা হয়েছে। তাছাড়াও রাম শবরীকে কি বলেছিলেন সেটাও দেখে নেওয়া যাক -

কচ্চিতে নির্জিতা বিঘ্নাঃ কচ্চিতে বর্ধতে তপঃ।
কচ্চিত্তে নিয়তঃ কোপে আহারশ্চ তপোধনে।।

....

(অরণ্যকাণ্ড - ৭৪/৮)

অনুবাদ: হে তপোধনে তোমার বিঘ্নসকল নিবারিত হইয়াছে ত? তোমার তপস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ত?.....

দেখুন, এখানে স্পষ্টই তপস্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ রয়েছে। এছাড়াও রামকে শবরী যখন নিজের গুরুর নির্দেশ ও উনি যেসব তপস্বীদের সেবা করতেন তাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন তখন রামও প্রত্যুত্তর দেন। সেখানের শ্লোকে শবরীর জ্ঞান স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে -

রাঘবঃ প্রাহ বিজ্ঞানে তাং নিত্যমবহিষ্কৃতাম্।

(অরণ্যকাণ্ড - ৭৪/১৯, প্রথম বাক্য)

অনুবাদ: পরমাত্মাতত্ত্বজ্ঞানে অবহিষ্কৃতা শর্বরীকে রাম বললেন.....

এই অংশের অনুবাদে অনেকে লিখেছেন - শবরী জাতিতে বর্ণবাহ্য হইলেও তত্ত্বজ্ঞানে বহিষ্কৃতা ছিলেন না। অর্থাৎ শবরী চতুর্বর্ণের বাহিরে ছিলেন বা শূদ্রের থেকেও নীচ অবস্থানে ছিলেন, শূদ্রতুল্য কর্মই সাধারণত এই ধরনের মানুষজনের জন্য নির্ধারিত থাকে। সেই শবরীকে যদি রাম কৃপা করতে পারেন এমনকি সেই শবরীর তপস্যা ঠিকঠাক বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না জিজ্ঞাসা করতে পারেন; সেই রাম কি করে শূদ্র বিদ্বেষী হয়ে যাবে!

শম্বুক (শূদ্র) হত্যার মূল কারণ পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি। উদ্দেশ্যের জন্যেই তপস্যার ন্যায় কার্যও নিন্দিত হয়। কঠোর তপস্যা কিন্তু ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে করা হলে কেউ বাধা দিবে না। তাছাড়া নিজের কর্তব্য কর্ম ফেলে না রেখেই সেগুলো করতে হয়। রামচন্দ্রের পূর্ব পুরুষ ভগীরথ একজন রাজা হলেও নিজের পিতৃ পুরুষদের দায় থেকে মুক্ত হন নি। তার তপস্যার বিষয়ে দেখা যাক -

"ধর্মশীল রাজর্ষি ভগীরথের সন্তান ছিল না। তিনি মন্ত্রীদের উপর রাজ্যচালনার ভার দিয়ে গোকর্ণ প্রদেশে গিয়ে গঙ্গাবতরণের নিমিত্ত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন।"

পিতৃপুরুষগণ মুক্ত হন নি বিধায় উনি প্রথমে রাজ্য পালন না করে তপস্যা করেছিলেন তারপর সিদ্ধ হয়ে পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কারণ পিতৃপুরুষ তুষ্ট না হলে কর্তব্য সম্পাদন হয় না। কর্তব্য পালন ও সৎ উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা নিষেধ নয়, এতে জগতের কল্যাণ হয় বা রাজ্যের মঙ্গল হয়। কিন্তু শম্বুকের ন্যায় আসুরিক মনোভাব নিয়ে তপস্যা অনুচিত।

আমি শুধুমাত্র রামায়ণ নির্ভর তথ্যের দ্বারাই রামের শূদ্র বিদ্বেষ বিষয়ক অভিযোগ নিয়ে সমাধানমূলক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। এ নিয়ে বিভিন্ন পুরাণে আরো বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। সেসব সহ পরবর্তীতে আরেকটি লেখা পরবর্তীতে দেওয়া যেতে পারে।

জয় শ্রী রাম🙏

তথ্যসূত্র:

১) বাল্মীকি রামায়ণ - সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী ন্যায়াচার্য এম. এ. কৃত বঙ্গানুবাদ
২) বাল্মীকি রামায়ণ - পঞ্চানন তর্করত্ন
৩) বাল্মীকি রামায়ণ - গীতাপ্রেস
৪) বাল্মীকি রামায়ণ - সারানুবাদ, রাজশেখর বসু
৫) রামায়ণ কথা - অমলেশ ভট্টাচার্য

কবিতা - কলাম

(শিব ছন্দম্) ১ নং কবিতাঃ- রূপ-তত্ত্ব-লীলা

অংকুর সুর

কৈলাস শিখরবাসী, দেব মহেশ্বর,
দিগম্বর বিভূতি লেপা, শান্তিময় হর।
ত্রিনয়ন জ্যোতির্ময়, কণ্ঠে গরল শোভিত,
জটা জুট চন্দ্রকলা, ভুজঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত।
ডমরু নিনাদে জাগে, প্রলয়ের হুঙ্কার,
যোগীন্দ্র ধ্যানমগ্ন, জপে নমঃ ওঁ-কার।
ভস্মাবৃত কলেবর, করুণার সিন্ধু,
ভক্তের হৃদয়ে সদা, ভক্তির বিন্দু
নৃমুণ্ড মালিকা গলে, রুদ্রাক্ষের আভরণ,
শিবনাম অমৃত সমান, জপে স্বয়ং রাবণ।
অভয় হস্তের দানে, জীবের মুক্তি ধাম,
শিব ভক্তি পরমা গতি, পূর্ণ করে মনস্কাম।



ব্যাখ্যা:- যিনি জ্ঞানরূপী কৈলাসের চূড়ায় বসবাস করেন, যিনি দশ দিক নিয়ন্ত্রণ করেন ও ভস্ম দ্বারা মায়ার ত্যাগ প্রকাশ করেন,যিনি ত্রিনেত্র অর্থাৎ তিনটি চোখ (অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত) ধারণ করেন, যাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ ও চাঁদের মতো উজ্জ্বল, যাঁর ডমরু সুরে প্রথম ধ্বনি ও প্রলয়ের ধ্বনি সৃষ্টি হয়, যাঁকে যোগীরা পাওয়ার আশায় থাকে চিরকাল, যিনি ভস্ম অর্থাৎ ত্যাগ স্বীকার করেও করুণাময়, যিনি শুধু জীবের হৃদয়ে আত্মারূপে বসবাস করেন, অসাধু নাশ করে যিনি কর্ম ফল প্রদান করেন, যাঁর নাম স্বয়ং রাবণ বলতেন, যিনি মুক্ত হস্তে দান করেন ও ভয়কে প্রেমে রুপান্তর করেন, যাঁর ভক্ত মৃত্যুর পর তাঁর সাথেই মিলে যায়, যিনি স্বয়ং মঙ্গল। সেই পরমেশ্বর "শিব"কে প্রণাম।

মূল কথা, শিব মানে ভয়হীনতা, শিব মানে শান্তি, শিব মানে নিজের ভেতরের শক্তিকে চিনে নেওয়া।

(শিব ছন্দম্) ২ নং কবিতাঃ- (শিব-শক্তি-লীলা)

অংকুর সুর

প্রকৃতিরূপা শক্তি, শিব চৈতন্য স্বরূপ,
উভয়ের মিলন বিন্দু, অনন্তের অনূপ।
তেজের প্রকাশ হয়, জ্যোতির্ময় ভাব,
সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত, ঘুচে সর্ব অভাব।
কুণ্ডলিনী শক্তি জাগে, মেরুদণ্ড বেয়ে ধায়,
সহস্রারে আত্মার সাথে, পরমাত্মায় মিশে যায়।
চক্রের দল বিকশিত, জ্ঞানালোক প্রস্ফুটিত,
মায়া বিনাশে আত্মা পরম আত্মায় একত্রিত।
আনন্দধারা বহে, দিব্য অনুভূতির সঞ্চার,
মায়ার আবরণ টুটে, হয় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার।
যোগী আত্মা লীন হয়, শিবের চরণতলে,
দ্বৈতভাব দূরীভূত, অদ্বৈতের মহিমা বলে।



ব্যাখ্যা:- শক্তি হল প্রকৃতি—সৃষ্টি, গতি ও প্রকাশ এবং শিব হল চৈতন্য—নিরাকার, নিয়ন্ত্রক, দর্শক সত্তা। শক্তি ও শিবের মিলনই সকল কিছুর সূচনা। এই মিলনই পরম শিব বা পরম সত্য। এই মিলনে অন্তর্জ্যোতি জাগে— জাগে আত্মজ্ঞান। যাঁর ফলে চেতনার জাগরণে জীবনের শূন্যতা দূর হয়, এই পরম মিলনে শক্তি মূলাধার থেকে জাগ্রত হয়ে সুষুম্না পথে ঊর্ধ্বগামী হয়। সহস্রারে জীবাত্মা শিবচৈতন্যে লীন হয়—এটাই মোক্ষ। এতে অজ্ঞান দূর হয়ে সত্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়। যা আটকে থাকে মায়ায় আর এই মায়া ভেঙে গেলে আর পৃথক সত্তা থাকে না—একই শিব। এই অবস্থায় কেবল আনন্দ—কারণ তখন আত্মাই আনন্দ। এটি কোনো কল্পনা নয়—সরাসরি উপলব্ধি যা ব্রহ্মের সাথে সাক্ষাৎ করায়। যোগীর 'আমি' বিলীন হয়ে শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি-তুমি সব ভেদ লুপ্ত। একমাত্র সত্য—এক শিব (ব্রহ্ম)।

মূল কথা, শক্তি যখন শিবকে পায়, তখন মানুষ নিজেকে হারিয়ে সত্যকে পায়।

কবিতা - কলাম

ঘরের মেয়ে সরস্বতী

নিরঞ্জন দাশ



মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের আসে বসন্ত পঞ্চমী,
মা সরস্বতী তুমি বিদ্যা, বাণী আর সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বিদ্যা দেবী, বীণাপাণি, বাগদেবী তোমারও চরণে প্রণমী,
কৃপা কর তবে মা তুমি পারমার্থিক জ্ঞানে যেন ভূষিত হই আমি।

তুমি মা মহাকালী, তুমি মা লক্ষ্মী তুমিই আবার সরস্বতী,
বসন্ত পঞ্চমীতে নেচে গেয়ে আনন্দে করি আরতি।

পুষ্পরথে চরে আসো তুমি এই ধরাধামে,
হংসযুক্তা বাহনে কর লীলা এই চরাচরে।



বীণার সুরে এই সৃষ্টিকে করো মধুময়।
তোমার ঐ রুপ দেখে হৃদয় হয়ে উঠে আনন্দময়।

তোমার চরণে বিদ্যার্থীরা করে আত্মসমর্পণ,
সোনামণিরা তোমাকে সখি হিসেবে করে আপন।

তুমি চঞ্চলা, তুমি শান্ত, তুমি মমতাময়ী মা, তুমিই আবার মেয়ে,
প্রতি বছর বসন্ত পঞ্চমীতে আসবে তুমি তাই থাকি পথ চেয়ে।



তুমি তোমার আলোয় আলোকিত করো এই ভূবন,
মাগো তুমি কৃপা করো অন্তিমে যেন পাই তোমারো চরণ।

বিদায় বেলায় অশ্রুসিক্ত হয় এই নয়ন হে ভগবতী,
তুই যে আমার মা, তুই যে আমার ঘরের মেয়ে সরস্বতী।

সংস্কৃত সহজপাঠ – দৈনিক প্রয়োগে উপযোগী শব্দ ও বাক্য

সংস্কৃত শব্দ	সংস্কৃত বাক্য
नि:श्रेयस (নিঃশ্রেয়স) - পরম কল্যাণ **सायं** (সায়ং) - সন্ধ্যা **क्षेत्र** (ক্ষেত্র) - জমি **अश्मन्** (অশ্মন্) - পাথর **अम्बुधि** (অম্বুধি) - সমুদ্র **उलूक** (উলূক) - পেঁচা **सर्पि:** (সর্পিঃ) - ঘি **ओदन** (ওদন) - রান্না করা ভাত **पौत्र** (পৌত্র) - নাতি **सुत** (সুত) - পুত্র	**कौयला: शतधौता: अपि मलिनत्वं न मुञ्चन्ति** কোয়লাঃ শতধৌতাঃ অপি মলিনত্বং ন মুঞ্চন্তি কয়লাকে শতবার ধুলেও তার মলিনতা মুছে না **धैर्यं सर्वत्र साधनम्** ধৈর্যং সর্বত্র সাধনম্ ধৈর্য সব জায়গায় সফলতার উপায় **उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै:** উদ্যমেন হি সিদ্ধ্যন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ পরিশ্রমেই কাজ সিদ্ধ হয়, কল্পনায় নয়

SCAN NOW

কোর্স করতে QR কোড স্ক্যান করুন বা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন...

চিত্রাঙ্কন কলাম



অঙ্কনে: পৃথা সান্যাল



অঙ্কনে: স্নেহা গাইন



আসছে নদী সূক্ত.......

ডিজিটাল কপি সংগ্রহ করুন আমাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে

ঋগ্বেদ সংহিতা ভাগের শাকল শাখার ১০ম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত, ৭৫ তম সূক্তটি হচ্ছে নদী সূক্ত। বাংলায় পরম্পরানুগ আচার্য্যদের ভাষ্যানুবাদ পাওয়া যায় না। তাই আপনাদের জন্য এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ। এই গ্রন্থটিতে আচার্য্য সায়ণ কৃত ভাষ্যানুবাদ থাকবে।



"প্রশ্নোত্তর পর্ব: আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর"

প্রশ্ন - ১: মনু স্মৃতিতে আছে ব্রাহ্মণ যতই অনিষ্ট করুক না কেন ব্রাহ্মণকে নিন্দা করা যাবে না। - এটা কতটুক যৌক্তিক, ব্রাহ্মণ কি অপরাধ করলে দণ্ডিত হবে না?

উত্তর: শুধু যে মনু স্মৃতিই মান্য হবে এমন ত নয়। যদিও বলা হয় মনু স্মৃতির সঙ্গে অন্য স্মৃতির বিরোধ হলে মনু স্মৃতিই মান্য। কিন্তু আচার্য্য সায়ণের বড় ভাই মাধবাচার্য যিনি বিদ্যারণ্য স্বামী নামে পরিচিত হয়েছিলেন ও শৃঙ্গেরী শারদা পীঠের জগদ্গুরু পদে ছিলেন উনি এই বিষয়ের মীমাংসা করেছেন। উনি পরাশর স্মৃতির টীকায় লিখেছেন - 'তস্মাৎ পরাশরোঽপি মনুসমান এব। এষ এব ন্যায়ো বশিষ্ঠাত্রিযাজ্ঞবল্ক্যাদিষু যোজনীয়ঃ। অর্থাৎ, পরাশরও মনুর সমান, সন্দেহ নাই; বশিষ্ঠ, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিতেও এই যুক্তির যোজনা করিতে হইবে।' আমরা জানি শ্রুতি শ্রুতি বিরোধ হলে দুটোই আলাদা আলাদাভাবে মান্য। সেক্ষেত্রে একই বিচারে সমপর্যায়ের স্মৃতি একটার সঙ্গে অন্যটি বিরোধ হলেও দুটোই মান্য। এবার অত্রি স্মৃতি থেকে দেখা যাক -
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ।।
(অত্রি - ৩৭২)
অনুবাদ: যে ব্রাহ্মণ বেদ এবং পরমাত্মতত্ত্ব কিছুই জানে না অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ "পশু" বলিয়া খ্যাত।
এছাড়াও 'ন হি নিন্দা ন্যায়' দ্বারা এক্ষেত্রে বিচার করতে হবে কারণ ব্রাহ্মণের প্রশংসা শ্রুতিতেও পাওয়া যায়। এই ন্যায় পদ্ধতির বিচার বুঝায় - শুধু প্রশংসাই নিতে হবে, নিন্দা নয়। তাছাড়া, যে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে তার জন্য কারোর নিন্দা করাটাও অকর্তব্য। অতএব, মনু সংহিতার উক্ত অংশে শুধু ব্রাহ্মণের প্রশংসাবাচক অংশ নিতে হবে, কিন্তু তাই বলে ব্রাহ্মণ অপরাধ করলে দণ্ডিত হবে না এমন নয়।

প্রশ্ন - ২: যদি কর্মই ফল নির্ধারণ করে, তবে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর: এটা বুঝার জন্য আপনাকে ঈশ্বর সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা লাভ করতে হবে। ব্রহ্ম বিষয়ক প্রবন্ধটি পড়লে বুঝতে পারবেন ব্রহ্মই এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্টির জন্য নিজ শক্তি মায়ার দ্বারা আবৃত হন। মায়াযুক্ত ব্রহ্মই মূলত ঈশ্বর। দর্শনের চিন্তা অনুযায়ী গুণহীন থেকে গুণ সৃষ্টি হতে পারে না। তাই, নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ হতে হয় এবং সগুণ ঈশ্বর থেকেই এই জগৎ সৃষ্টি হয় আবার এই সগুণ ঈশ্বরেই সবকিছু লীন হয়। কর্ম করলে সে অনুযায়ী ফল প্রাপ্ত হয় ঠিক কিন্তু সেই ফলও সগুণ ঈশ্বর থেকেই প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ দেব দেবী রূপে বিভিন্ন ফল প্রদান করেন। বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের ফলও দেবদেবীগণ প্রদান করেন। এছাড়াও অদ্বৈতে নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ঈশ্বরে বাস্তবিক তফাৎ নেই; তত্ত্বগত ভাবে একই। আবার, শ্রুতি বচন অনুযায়ী সবই ব্রহ্মময় ও ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। সে হিসেবে ব্রহ্মকে জানাই সবার মূল উদ্দেশ্য। নির্গুণ ব্রহ্মকে জানা যায় না, সগুণ ব্রহ্ম তথা ঈশ্বরের উপাসনার মাধ্যমেই চিত্ত শুদ্ধি হয় ও আত্মোপলব্ধি তথা ব্রহ্ম উপলব্ধির পথ সুগম হয়। জীব মুক্তি তথা মোক্ষ লাভ করে থাকে!

প্রশ্ন - ৩: মূর্তিতে যেমন ঈশ্বর ব্যাপক তেমনি ফুলেও ঈশ্বর ব্যাপক। তাহলে আপনি ফুলের মালা কেন মূর্তিতে পড়ান? (অনার্য <স্বঘোষিত আর্য> সমাজ কৃত প্রশ্ন)

উত্তর: প্রশ্নকারীগণ ত ঈশ্বরের সাকার রূপকেই স্বীকার করেন না। অথচ শ্রুতি প্রমাণ অনুযায়ী ঈশ্বরের সাকার রূপের প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি দিয়ে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি বলেই ফুল ইত্যাদির ব্যবহার করেই পূজা করা হয়। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, ব্রহ্মই সত্য এই ধরনের চিন্তা অদ্বৈত কিন্তু ব্যবহারিক উপাসনায় দ্বৈতাদি দর্শন অনুযায়ীই চিন্তা করতে হয়। শাস্ত্রে প্রধান চার মার্গের মধ্যে ভক্তি মার্গ একটি এবং এই ভক্তি মার্গের অংশ হিসেবেও বিভিন্ন নিয়ম মান্য করতে হয়। ফুল দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, যাকে পূজার অঙ্গ তথা পুষ্পাঞ্জলী বলা হয়। ফুল দিয়ে সাজানোর বিষয়টাকে শৃঙ্গার বলা হয়। যজ্ঞের ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন নিয়ম কানুন মান্য করতে হয় সেরকম এক্ষেত্রেও। যদি ঈশ্বরের প্রতিমায় ফুলের মালা দেওয়াটা অনুচিত হয় তাহলে আপনাদের কাছে যজ্ঞ করা কেন উচিৎ? ঈশ্বরের যে বিভিন্ন রূপ রয়েছে সেটা ত পুরুষ সূক্ত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপ দর্শন অংশ দ্বারাই প্রমাণ হয়। সেই রূপগুলোর প্রতিকৃতিকে অর্চনা করার পদ্ধতি মেনেই অর্চনা করা হয়, এতে কোন ভুল নেই বরং এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনই অবান্তর!

আপনার প্রশ্ন পাঠাতে অনুসরণ করুন অথবা **স্ক্যান করুন**

To: shashwata.satya@gmail.com

Subject: প্রশ্নোত্তর পর্ব

Compose email
প্রশ্ন - ....?
নাম - (বাংলায় আপনার নাম লিখবেন)
ঠিকানা - (উপজেলা, জেলা ও বিভাগের নাম লিখবেন)

Scan

ধ্যায়েয়ং রত্নপীঠে শুককলপঠিতং শৃণ্বতীং শ্যামলাঙ্গীং
ন্যস্তৈকাঙ্ঘ্রিং সরোজে শশিশকলধরাং বল্লকীং বাদয়ন্তীম্।
কহ্লারাবদ্ধমালাং নিয়মিতবিলসচ্চোলিকাং রক্তবস্ত্রাং
মাতঙ্গীং শঙ্খপাত্রাং মধুরমধুমদাং চিত্রকোদ্ভাসিভালাম্।।

অনুবাদ – যিনি রত্নময় বেদীতে অধিষ্ঠিতা ও শুকপাখীর কলরব-শ্রবণে নিমগ্না, যাঁহার একপদ কমলোপরি প্রতিষ্ঠিত, যিনি শশিশেখরা, বীণাবাদিনী ও কহলার-পুষ্পের মালাধারিণী, যিনি রক্তবস্ত্রপরিহিতা, শঙ্খ-পাত্রধারিণী ও সুমিষ্ট অমৃত-পানে উন্মত্তা, যাঁহার হস্তে চুড়িকা সুষ্ঠুরূপে শোভিত এবং যাঁহার কপাল চিত্রবিশেষ দ্বারা উদ্ভাসিত, সেই শ্যামলাঙ্গী মাতঙ্গী দেবীকে আমি ধ্যান করি।



জ্ঞানচর্চা প্রকাশনী